pathagar.net

“

পরাশর বর্মা ওই নামে গোয়েন্দা হিসাবেই অবশ্য আমায় দেখা দেয়নি। তবে ঘটনাচক্রে কয়েকটা অসংলগ্ন ব্যাপার এক সঙ্গে জড়িয়ে ওই চরিত্রটির আভাস আমার মনে যেন ফুটিয়ে তুলেছিল।

•

কবি হয়েও পরাশর বর্মাকে গোয়েন্দাগিরি করতে হয়, কিন্তু শার্লক হোমস, পোয়ারো কি মাইগ্রে কারও সঙ্গে কোনও আত্মীয়তা তার নেই। আত্মীয়তা পাতাবার চেষ্টাও সে কখনও করে না।

”

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পরাশর সমগ্র

pathagar.net

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সম্পাদনা : সুরজিৎ দাশগুপ্ত

ARKA PRABHA DUTTA GUPTA
Book No.
Ph.
ZICO

আনন্দ

পাঠকদের প্রতিঃ-

পরাশর সমগ্র বইটি আনন্দ পাবলিশার্স কোন অজ্ঞাত কারণে আর প্রকাশ করে না। বইটা ভাগ্যক্রমে আমার কাছে আগে ছিল তাই দিতে পারলাম।

তবে বইটাকে আমি ভালো করে কার্ডবোর্ড বাঁধাই করিয়ে নিয়েছিলাম। তাই বার বার পাঠকদের অনুরোধ সত্ত্বেও দিতে চাইছিলাম না। শেষ অবধি আপনাদের ইচ্ছেরই জয় হলো।

বইটার বাধাঁই কেটে আমি স্ক্যান করলাম। তবে তা সত্ত্বেও একটু অসুবিধা হলো কয়েক জায়গা একটু কম পরিস্কার থাকল। ওটা ক্ষমা-ঘেন্না করে নেবেন।

দ্বিতীয়ত- বইটা আমি একবারে দেব না। আস্তে আস্তে খন্ডে খন্ডে দেব। সাইটেই সেগুলি পাবেন।

-5 JAN 2011

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রর প্রথম প্রসিদ্ধ প্রবেশ ঘটে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকার মার্চ সংখ্যায় 'শুধু কেরানি' নামে একটি ছোটগল্পের লেখক রূপে। পরের সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় 'গোপনচারিণী' গল্পটি। সাড়া পড়ে যায় বাংলার সারস্বত সমাজে। তাঁর এই আবির্ভাবের ইতিহাস যেমন স্পষ্ট তাঁর সাহিত্যিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস তেমন স্বচ্ছ নয়। এমনকী পরাশর বর্মাকে নিয়ে লেখা তাঁর অনবদ্য কাহিনিগুলির অনেকগুলিই কবে লেখা হয়েছিল, কোথায় প্রথম বেরিয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। এই গ্রন্থের পেছনে যে-গ্রন্থপরিচয় দেওয়া হল তাতে চোখ বোলালেই পরাশরের কাহিনি সংবলিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের বিষয়ে খবরাখবরের অসম্পূর্ণতা চোখে পড়বে। পরাশর বর্মাকে নিয়ে যত বই বেরিয়েছে বা যত গল্প লেখা হয়েছে সবগুলি এই গ্রন্থের এক জোড়া মলাটের ভেতরে সংগ্রহ করা গেছে কি না এ-বিষয়েও সংশয় রয়েছে। এই গ্রন্থে সংকলিত রচনাগুলির বাইরে যে পরাশরের আরও কাহিনি থাকা সম্ভব এ কথা গোড়াতেই স্বীকার করা ভাল। প্রকৃতপক্ষে পরাশরের কতগুলি কাহিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন, কোনটা কখন কোনখানে বেরিয়েছিল এসব তথ্য অন্বেষণ ও আবিষ্কার করার জন্য পরাশর বর্মার মতো প্রতিভাবান গোয়েন্দারই একান্ত প্রয়োজন। তবু রচনাকাল সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পেয়েছি এবং কাহিনিগুলি পড়ে যেটুকু অনুমান করতে পেরেছি সেই অনুসারে লেখাগুলি কালানুক্রমে সাজাবার চেষ্টা করেছি।

যতদূর জানা যায়, ১৯৩২ সালে 'রোমাঞ্চ' নামে একটি পত্রিকার পাতায় পরাশর বর্মার প্রথম প্রকাশ। প্রেমেন্দ্র তখন 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক। 'বঙ্গবাণী'-র আগে নাম ছিল 'বাংলার কথা'। একটি ট্রেন দুর্ঘটনার মামলা চলা কালে ওই মামলা সংক্রান্ত খবর বের করার জন্য 'বাংলার কথা'র উপরে ১৯৩০ সালে আদালতের নিষেধাজ্ঞা জারি হলে 'বাংলার কথা' নাম পালটে রাখা হয় 'বঙ্গবাণী'। প্রেমেন্দ্র শুরু থেকেই বাংলার জাতীয়তাবাদীদের মুখপত্র 'বাংলার কথা'র সহকারী সম্পাদক, পরে 'বঙ্গবাণী'রও ১৯৩৪-এ শেষ পর্যন্ত ওই পদে বহাল থাকেন। কিন্তু পত্রিকাটির সহ-সম্পাদকের মাইনে ছিল যৎসামান্য। তাই সেই কাজের সঙ্গে আরও একটি কাজ নেন বেঙ্গল ইমিউনিটি নামের ওষুধ কোম্পানিতে প্রচার সচিব রূপে। তেমনই সময়ে তিনি 'গোয়েন্দা কবি পরাশর' নামে পরাশরের প্রথম গল্পটি লেখেন। তাতে দেখি যে তার লেখক-চরিত্র এক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক আর তাঁর কাছে পরাশর গেছেন স্বরচিত কবিতা সেই সাপ্তাহিকে ছাপাবার আর্জি নিয়ে।

এই গল্পের পরে প্রেমেন্দ্র একে একে পরাশরের আরও গল্প লেখেন। গল্পগুলিতে উল্লিখিত সম্পাদকের নাম কৃত্তিবাস ভদ্র এবং ক্রমে ক্রমে কৃত্তিবাস ভদ্র পরিণত হন পরাশরের পরম বন্ধুতে, প্রচারকে ও সহকারীতে। যতই গল্পের পর গল্প লেখা হয় ততই পরাশরের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে আর ততই বিস্তারিত হতে থাকে কৃত্তিবাসের আনুগত্য। এই কৃত্তিবাস ভদ্র একেবারে অলীক চরিত্র নয়। প্রেমেন্দ্র যখন 'কালি-কলম' পত্রিকার তিন সম্পাদকের একজন ছিলেন তখন কৃত্তিবাস ভদ্র ছদ্মনামে 'অসংলগ্ন' শিরোনামে ছোট ছোট নিবন্ধের আকারে সমকালীন বিভিন্ন প্রসঙ্গের উপর মন্তব্যাদি লিখতেন। অর্থাৎ গল্পে বর্ণিত সম্পাদক কৃত্তিবাস ভদ্রর শিকড় বাস্তবেও রয়েছে।

এই পর্যবেক্ষণের তাৎপর্য পরিষ্কার হবে যদি এখানে স্বাক্ষরতা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত 'আদ্যোপান্ত পরাশর' গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯৭৭-এর ১০ আগস্ট যা লিখেছিলেন তা সম্পূর্ণত উদ্ধার করে দিই। অন্যান্য গ্রন্থ থেকে পরাশরের কয়েকটা গল্প বেছে নিয়ে 'আদ্যোপান্ত পরাশর' সংকলনখানি প্রস্তুত করে তিনি 'প্রাসঙ্গিক' শিরোনামে লিখেছিলেন,

'লেখকেরা তাঁদের গল্প-উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রই মন থেকে তৈরি করেন। কোনও কোনও চরিত্র কিন্তু তাঁদের কাছে নিজে থেকে আসে।

'পরাশর বর্মা যেমন আমার কাছে এসেছিল অতর্কিতভাবে।

'ছেলেবেলা থেকেই ছাপার অক্ষরে লেখা প্রায় সব কিছুই গোগ্রাসে পড়া আমার একটা রোগ বলে স্বীকার করতে পারি। তার মধ্যে ডিটেকটিভ গল্প অবশ্যই বাদ পড়েনি।

'ভাল করে ইংরেজি বোঝার আগে থেকেই স্যার আর্থার কোনান ডয়েল-এর অমর সৃষ্টি গোয়েন্দা-চূড়ামণি শার্লক হোমস-এর কীর্তিকলাপ দিয়ে শুরু করেছি। তার পর ছোট বড়, নগণ্য বরেণ্য বিদেশি রহস্য সাহিত্যের প্রায় সব ডিটেকটিভের সঙ্গেই অল্পবিস্তর পরিচয় হয়েছে। কোনান ডয়েল-এর শার্লক হোমস থেকে আগাথা ক্রিস্টি-র হারক্যুলে পোয়ারো পর্যন্ত যে-সব গোয়েন্দার বাহাদুরির বৃত্তান্ত উপভোগ করেছি, বাংলায় তাদের দেখাদেখি কাউকে আমদানি করার কথা কিন্তু কখনও মাথায় আসেনি।

'গোয়েন্দা কাহিনি বিশুদ্ধ সাহিত্যের চেয়ে জাতে ছোট এ রকম কোনও ধারণা থেকে তা লেখায় বিমুখ কিন্তু ছিলাম না। আমাদের বাংলা ভাষাতেই দু-একজন উন্নাসিক সাহিত্যিকের ডিটেকটিভ কাহিনি গোছের লেখার প্রতি একই অবজ্ঞার ভাব অবশ্য ছিল, এখনও হয়তো কারও কারও নেই এমন নয়। কলম নোংরা হবার ভয়ে তাঁরা গোয়েন্দা কাহিনি লেখেন না তো বটেই, পড়াটাও লজ্জাকর মনে করেন।

pathagar.net

'আর সব রসের মধ্যে রহস্যের রসে বঞ্চিত এ-সব ছুঁতমার্গীদের জন্য দুঃখ হওয়ারই কথা। তারা শার্লক হোমস-এর আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ আর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দুর্ভেদ্য রহস্যের অপ্রত্যাশিত সমাধানের চমক উপভোগ করতে পারে না, জি. কে. চেস্টারটন-এর ফাদার ব্রাউন-এর মাধ্যমে পুণ্যের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে পাপের কুজ্ঝটিকা ভেদের রসাল উত্তেজনা থেকে বঞ্চিত হয়। সিমেন-এর ইন্সপেক্টর মাইগ্রে-র সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব হয় না। আগাথা ক্রিস্টি-র হারক্যুলে পোয়ারো-র গোয়েন্দাগিরির অভিনব বিচক্ষণতার সঙ্গে আশাতীত জীবন-বীক্ষার স্বাদ তারা পায় না।

'সবচেয়ে মজার কথা এই যে, আর কিছু না হোক দুনিয়ায় আধুনিক কবিতার আদি প্রবর্তক হিসেবে যাঁর নামে সাহিত্যের এই সব গোঁড়া নাক-তোলা জাত্যাভিমানীরা গদগদ, এ যুগের বিচক্ষণ যুক্তিনির্ভর গোয়েন্দা কাহিনিরও জন্ম যে সেই লেখকেরই কলমে এ খবরটা এদের অনেকের বোধহয় জানা নেই। বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো যাঁর কাছে এ কালের কবিতার প্রেরণা পেয়েছেন, বিশ্ব-বিমোহন শার্লক হোমস-এরও আদি মডেলের তিনিই সত্যি-স্রষ্টা।

'এ মানুষটি ফরাসী জার্মান ইংরেজ বা ইওরোপের কোনও দেশেরই নন। তিনি মার্কিন। আগের শতাব্দীর গোড়ায় জন্ম নিয়ে মাত্র চল্লিশ বছরের পরমায়ুতে এমন কিছু নতুন পথ কাটার কাজ করে গিয়েছেন যার মুগ্ধ স্বীকৃতি পাচ্ছেন একশো বছরের পরে।

'এই এডগার অ্যালেন পো-র কলমে যার জন্ম রহস্য-রোমাঞ্চের সেই গোয়েন্দা কাহিনিকে জাত বিচারে অচ্ছুত করে রাখা বোধহয় চলে না। আর তা করলেও তাকে ঠেকিয়ে রাখা কারও সাধ্য নয়। পো-র বীজমন্ত্র থেকে শার্লক হোমস-এ প্রাণ পেয়ে আজ বিশ্বের এমন কোনও ভাষা বোধহয় নেই যাতে দিগ্বিজয়ের রথ সে চালায়নি। ভাল-মন্দ সরেস-নিরেস যেমনই হোক, দুনিয়ায় রহস্য-কাহিনির ফলন আর চাহিদা বোধহয় সব চেয়ে বেশি। আইন-শৃঙ্খলে বাঁধা আমাদের সাধারণ প্রাত্যহিক ক্রমশ ছক-বাঁধা যান্ত্রিকতায় একঘেয়ে হয়ে আসে বলে প্রতিষেধক হিসেবে এ-ধরনের বল্গাছাড়া কাল্পনিক উত্তেজনা আর রোমাঞ্চের প্রয়োজনও বোধহয় এ-সব কাহিনি মেটায়।

'রহস্য-ও-গোয়েন্দা-কাহিনির পাঠক থেকে লেখক হওয়াটা সত্যিই নিতান্ত অপ্রত্যাশিত আর আকস্মিক। পরাশর যদি নিজে থেকে হঠাৎ একদিন দেখা না দিত তা হলে এ-পথ নিশ্চয় মাড়াতাম না।

'পরাশর বর্মা ওই নামে গোয়েন্দা হিসাবেই অবশ্য আমায় দেখা দেয়নি। তবে ঘটনাচক্রে কয়েকটা অসংলগ্ন ব্যাপার এক সঙ্গে জড়িয়ে ওই চরিত্রটির আভাস আমার মনে যেন ফুটিয়ে তুলেছিল।

'কলকাতার একটি বড় ওষুধ তৈরির প্রতিষ্ঠানে প্রচার-সচিব হিসেবে তখন কাজ করি। একটি সাপ্তাহিকের সম্পাদনাও সেই সঙ্গে করতে হয়।

'সেদিন ছোটখাটো একটি নগণ্য পত্রিকা থেকে কে একজন বিজ্ঞাপনের অর্ডার নিতে এসেছিলেন। প্রায় মিনি-মাগনার বিজ্ঞাপন—তাই সরাসরি অর্ডারটা সই করে তাঁকে বিদায় করতে চেয়েছিলাম। কাগজের প্রতিনিধি কিন্তু চলে না গিয়ে একটু গায়ে পড়ে ঘনিষ্ঠতার সুরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনার সবুজ কালি কী হল?"

' "সবুজ কালি?" এক সঙ্গে অবাক আর বিরক্ত হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে বলেছিলাম, "সবুজ কালির কথা কী বলছেন!"

' "না, মানে," ভদ্রলোক খুব অপ্রস্তুত না হয়ে বললেন, "আপনি সাধারণত সবুজ কালি ব্যবহার করেন কিনা, তাই বললাম—"

'ভদ্রলোককে রূঢ়ভাবেই বাধা দিয়ে বললাম, "আমি সবুজ কালি ব্যবহার করি কে বললে আপনাকে?"

'প্রথমে একটু থতমত খেলেও ভদ্রলোকের মুখে তার পর একটু কৌতুকই ফুটে উঠল। তারই সুরে বললেন, "বললে আপনার ব্লটিং প্যাড।"

'এ-কথার পর আমার টেবিলের ব্লটিং প্যাডটা দেখিয়ে তিনি আবার বললেন, "এ কামরায় তো আপনি একাই বসেন। ব্লটিং প্যাডে প্রায় সমস্ত ছাপই সবুজ থেকে, সুতরাং ওই কালিই আপনি ব্যবহার করেন বোঝা উচিত না কি!"

'এবার হেসে ফেলে ভদ্রলোকের কাছে একটু বিশদই হলাম। বললাম, "আপনি লক্ষ করেছেন ঠিকই। তবে ও প্যাডটা গত দুদিনের মাত্র। এ দুদিন আমার নিজের পেনটা খারাপ হওয়ায় আমার এক আত্মীয়ের কলম ধার করে এনে ব্যবহার করছিলাম। তিনি সবুজ কালিই পছন্দ করেন। আমি কিন্তু কালো ছাড়া কিছু নয়। যাই হোক মীমাংসাটা ভুল হলেও আপনার খুঁটিয়ে দেখার ক্ষমতাটার তারিফ করছি।"

'ভদ্রলোককে ওই বলে বিদায় দেবার পর টেবিলের একটা ট্রেতে রাখা লেখার তাড়াগুলির ওপর নজর পড়েছিল। বেশির ভাগই তার কবিতার বান্ডিল। বেশির ভাগ রাবিশ ওই সবগুলোর ওপর একবার অন্তত চোখ বুলোতে হবে ভেবে যে বিরক্তিটা মনে জাগল তার মধ্যে কেমন করে যেন গোয়েন্দা কবি পরাশর বর্মার আবির্ভাব। পরাশর নামটা হয়তো কোনও লেখার তাড়ার ওপরে দেখেছিলাম। বর্মা পদবিটা আমার সংযোজন।

'কবি হয়েও পরাশর বর্মাকে গোয়েন্দাগিরি করতে হয়, কিন্তু শার্লক হোমস, পোয়ারো কি মাইগ্রে কারও সঙ্গে কোনও আত্মীয়তা তার নেই। আত্মীয়তা পাতাবার চেষ্টাও সে কখনও করে না।

'কবিতা লেখার সঙ্গে গোয়েন্দাগিরি করা তার কাছে আসলে একটা মজার খেলা। তার কীর্তিকলাপ বর্ণনা আমার কাছেও কলমের একটা মন-মাতানো ছুটি।'

কিন্তু ১৯৩২-এ পরাশরকে নিয়ে প্রথম গল্প লেখার পরে প্রেমেন্দ্র আবার কবে পরাশরকে নিয়ে গল্প লেখা শুরু করেন? আমাদের হাতে পরাশরের যেসব বই এসেছে সেসবের মধ্যে

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি কর্তৃক ১৯৬০ সালে প্রকাশিত 'পরাশর' বইখানিই প্রথম এবং তার মধ্যে ১৯৩২-এ লেখা 'গোয়েন্দা কবি পরাশর' গল্পটিও আছে। ওই একই বইয়ের অন্য একটি গল্প 'সাংঘাতিক শিশি ও পরাশর'-এর ঘটনাস্থল তখনকার বম্বে। হঠাৎ তিনি বম্বের সমুদ্রতীরের বর্ণনা দিয়ে পরাশরের গল্প লিখলেন কেন? উত্তরে বলা যায় যে ১৯৫৪-তে প্রেমেন্দ্র ফিল্মিস্তান নামক বম্বের একটি ফিল্ম কোম্পানির কাজে নিজেই বম্বে চলে যান যেভাবে একদা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বম্বে গিয়েছিলেন জীবিকায় সুরাহা সন্ধানে। কিন্তু প্রেমেন্দ্র স্থায়ীভাবে বম্বেবাসী হননি, এক বছর পূর্ণ হবার আগেই কলকাতায় ফিরে আসেন। মনে হয় সেই কয়েক মাসের জন্য বম্বেবাসের সুবাদেই 'সাংঘাতিক শিশি ও পরাশর' গল্পটি ১৯৫৪-৫৫ নাগাদ লেখেন। ওই একই বইয়ে রয়েছে 'পরাশর বর্মা ও অশ্লীল বই' নামে একটি গল্প—যেটি ১৯৫৮ সালে 'উল্টোরথ' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় যে বেরিয়েছিল তা শ্রীসৌম্যেন পালের পত্রিকা-সংগ্রহ থেকে জানা যায়। অতঃপর আমরা অনুমান করতে পারি যে পরাশরের গল্প ১৯৩২-এ প্রথম লেখা হলেও কৃত্তিবাস ভদ্রের বয়ানে পরাশরের কীর্তি-কাহিনি প্রচারের বিশেষ আগ্রহ প্রেমেন্দ্রর মনে জেগেছিল পঞ্চাশের দশকেই।

এবং পঞ্চাশের দশকেই প্রকাশিত 'বৃষ্টি এল' নামক প্রবন্ধ-গ্রন্থর অন্তর্গত 'সাহিত্যে রোমাঞ্চ' প্রবন্ধটিতে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন, 'জাত যদি যায় যাক, তবু নির্লজ্জভাবেই স্বীকার করছি যে, রহস্য-কাহিনি আমি ভালবাসি।

'আজ নয়, চিরকালই ভালবাসি এবং শুধু ডিটেকটিভ গল্প নয়, রোমাঞ্চকর যত রকমের গল্প আছে সব কিছুরই বরাবর আমি ভক্ত। এখনও ভাল সেরকম গল্প পেলে আহার নিদ্রা আমি ত্যাগ করতে পারি।'

কিন্তু বিভিন্ন জাতের রোমাঞ্চকর কাহিনির মধ্যে কোন জাতের কাহিনি তাঁকে সবচেয়ে বেশি টানে? এই প্রবন্ধেই তিনি আরও লেখেন, 'সাহিত্যে যাঁরা জাত বিচার করতে চান তাঁরা যতই নাসিকাকুঞ্চন করুন তাঁদের নাকের বালাই নিয়ে গোয়েন্দা-গল্পের মারা যাবার অবশ্য কোনও সম্ভাবনা নেই। সাহিত্য-সভার জমকালো আসরে তার আসন না মিলতে পারে কিন্তু সভার বাইরে তার গরিবানি তাঁবুতে ভিড় বুঝি সব সময়েই বেশি। তার মানে খুঁজতে বেশি দূর যেতে হবে না। আমাদের মনের সবচেয়ে প্রবল যে বৃত্তি, গোয়েন্দা-কাহিনির আকর্ষণের হেতু তার মাঝেই পাওয়া যাবে। সে বৃত্তি হল অজানা রহস্য সম্বন্ধে কৌতূহল।'

এই বক্তব্য আরও বিস্তৃত করে প্রেমেন্দ্র মিত্র 'বাংলায় ডিটেকটিভ গল্প' নামে আর-একটি প্রবন্ধ লেখেন যা ১৯৮১-তে 'শত প্রসঙ্গ'-তে প্রথম গ্রন্থিত হয়। তাতে তিনি লেখেন,

'বর্তমান কালে অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা সাহিত্যেও ডিটেকটিভ গল্পের প্রাচুর্য যথেষ্ট কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, উচ্চাঙ্গের এই জাতীয় মৌলিক রচনা খুব বেশি চোখে পড়ে না। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর সমান দরের লেখকের নাম বলতে বেশ আকাশ-পাতাল ভাবতে হয়। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও এই একটি জনপ্রিয় বিভাগের প্রতি সত্যকার ক্ষমতাবান লেখকদের এই ঔদাসীন্য বিস্ময়করই বটে। কারণ, রহস্য রোমাঞ্চের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। কিন্তু সেই আকর্ষণকে কেন্দ্র করে যে বিশেষ সাহিত্যের শাখা গড়ে উঠেছে তার জন্ম একেবারে আধুনিক কালেই বলা যায়। তা হলেও রহস্য রোমাঞ্চের স্বাদ সেই আদিকালের মহাকাব্যে রূপকথাতেই কি পাই না? রূপকথার রাজপুত্র রাক্ষসীর মায়ায় পড়ে ঘুমন্ত পুরীর রহস্য ভেদ করতেই রোমাঞ্চকর অভিযানে বার হত। আর আদি মহাকাব্যের মহাকবিরা ইচ্ছে করলে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, তাঁদের অনেক কাহিনীতেই আধুনিক গোয়েন্দা গল্পকে টেক্কা দিতে পারতেন। রহস্য কাহিনির বীজ অন্তত সেখানে যথেষ্ট। মহাভারতের বিরাট পর্বই ধরা যাক না। মহাকবি বেদব্যাস যদি গোড়াতেই সব রহস্য ফাঁস না করে পাঠকদের সঙ্গে একটু চাতুরী খেলতেন, তা হলে কীচক বধ নিয়ে একটা গভীর রহস্যঘন

ডিটেকটিভ কাহিনি কি গড়ে উঠতে পারত না?

'পরিবেশ উপকরণ সবই তো ছিল যথোচিত। বিরাট রাজ্যে কিছুদিন ধরে আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটেছে। মৎস্য রাজধানীতে ব্রহ্মার নামে যে মেলা হয় তাতে সামান্য একজন পাচক মল্লযুদ্ধে সেরা এক দুর্ধর্ষ পালোয়ানকে তুলোধোনা করে ছেড়েছে। তারপর রাজ্যের প্রধান সেনাপতি—ক্ষমতায় প্রতিপত্তিতে যিনি বিরাট রাজারও ওপরে বলে সন্দেহ হয়—হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে নির্জন অন্ধকার নৃত্যশালায় তাঁর তাল-গোল পাকানো মৃতদেহ পাওয়া গেল। এ কার কাজ? তেমন বিচক্ষণ সন্ধানী খোঁজ-খবর নিতে নিতে এইবার জানতে পারলেন বিরাট রাজ্যে মাস-চারেক আগে ক-জন নতুন লোক ঢুকেছে। তাদের চালচলন চেহারা কেমন সন্দেহজনক। এই সন্দেহের সূত্র ধরে বেশ ঘোরালো এক রহস্যজালের মধ্যে পাঠককে উত্তেজনাময় ঘুরপাক খাওয়ানো নিশ্চয় যেত।

'বেদব্যাস অবশ্য সে পথে গিয়ে মহাভারতকে সুলভ করেননি, কিন্তু রহস্য রোমাঞ্চের স্বাদ কিছুটা পরিবেশন করেছেন।

'ডিটেকটিভ কাহিনি বলে যে একটি বিশেষ ধরনের লেখা আজকের দিনে সর্ব দেশে ও ভাষায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তার জন্ম তারিখ এক হিসেবে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ ধরা যায়। ওই বৎসরেই Study in Scarlet নামে একটি বিস্ময়কর উপন্যাস প্রকাশিত হয়। সে উপন্যাসের লেখক ইংলন্ডের সাউথসী অঞ্চলের মাঝামাঝি পসারের একজন ডাক্তার। একদিন সেই অখ্যাত ডাক্তার আধুনিক গোয়েন্দা কাহিনির জনক হিসেবে চিরস্মরণীয় হবেন এবং তাঁর চেয়ে তাঁর সৃষ্ট একটি অনন্যসাধারণ চরিত্র আরও বিখ্যাত হয়ে সারা পৃথিবীতে মুগ্ধ অনুরাগীদের মুখে মুখে ফিরবে একথা সেদিন নিশ্চয় কেউ কল্পনা করতে পারেনি।

'লেখকের নাম আর্থার কোনান ডয়েল (পরে যিনি স্যার খেতাব পেয়েছিলেন) আর তাঁর সৃষ্ট চরিত্র হল শার্লক হোমস্।

'শার্লক হোমস্-এর কীর্তি-কাহিনি থেকেই গোয়েন্দা কাহিনির বিশ্ব-বিজয় শুরু। আজকের দিনে পৃথিবীর প্রধান সমস্ত ভাষায় প্রকাশিত ডিটেকটিভ কাহিনির সংখ্যা অন্য সব শ্রেণীর সাহিত্যের চেয়ে অনেক বেশি বোধ হয়। এমন জনপ্রিয় গোয়েন্দা-কাহিনির লেখক লেখিকা আছেন যাঁদের এক-একটি বই হেসে খেলে লক্ষাধিক বিক্রি হয়।

'সুতরাং দেখা যাচ্ছে সাহিত্যে যাঁরা জাত বিচার করতে চান তাঁরা যতই নাসিকা-কুঞ্চন করুন, তাঁদের নাকের বালাই নিয়ে গোয়েন্দা গল্পের মারা যাবার কোনও সম্ভাবনা নেই। সাহিত্য-সভার জমকালো পাকা আসরে তার আসন না মিলুক মেলার বেশির ভাগ ভিড় তার তালিমারা শামিয়ানার তলায়। তার কারণটা ব্যাখ্যা করে বলবার দরকার নেই। আমাদের মনের সবচেয়ে প্রবল যে বৃত্তি, অজানা সম্বন্ধে সেই কৌতূহলই গোয়েন্দা-কাহিনির মূলধন।

'তথাকথিত সৎ সাহিত্যের তুলনায় গোয়েন্দা-কাহিনির আর একটি মস্ত গুণের কথাও বলা উচিত। তা হল তার সাধুতা আর সরলতা।

'জটিল কুটিল শঠ কপট নিয়েই তার কারবার, কিন্তু পাঠকের সঙ্গে সত্যিকার কোনও অসাধুতা সে করে না। সাহিত্যের নামে অনেক গল্প উপন্যাস নাটক সৎ অসৎ শোভন অশোভন কত রকম সওদাই তো ফিরি করে, কিন্তু গোয়েন্দা-কাহিনির বেসাতি একেবারে নির্ভেজাল রহস্য নিয়েই শুধু। ঘোর প্যাঁচ যা থাকবার তা তার কাহিনি-বিন্যাসেই থাকে, উদ্দেশ্যে নয়। কোনও ছদ্মবেশী সাহিত্যের মতো নিরীহ অসন্দিগ্ধ পাঠককে গল্পের প্রলোভনে উদ্ভট নীতির সমস্যাসংকুল দুর্গমতায় সে টেনে আনে না।

'এছাড়া সত্যি গভীরভাবে ভাবলে ডিটেকটিভ গল্পের অদম্য আকর্ষণের আরও একটা নিগূঢ় কারণ আছে বলে মনে হয়। সেই কারণে অন্তত অবজ্ঞা করা দূরে থাক রহস্য-কাহিনির চর্চাকে এ যুগে প্রশ্রয় দেবারই বোধহয় বিশেষ প্রয়োজন।

'যান্ত্রিক শৃঙ্খলা দিয়ে মুড়ে পৃথিবীকে আসলে না হলেও বাইরের চেহারায় আমরা ক্রমশ নিরাপদ একঘেয়ে ও সাধারণ করে তুলছি। যত অপটুভাবেই হোক রোমাঞ্চকর কাহিনি সেই সাধারণত্বের পর্দা সরিয়ে পৃথিবীর অন্তহীন রহস্যঘনিমাই বার বার ঘোষণা করতে চায়। ট্রামে বাসে কি লোক্যাল কম্পিউটার ট্রেনে আফিস কাছারি পর্যন্ত যাদের দৌড় অজানা দুঃসাহসের পথে বার হবার দুধের স্বাদ তারা এই ঘোলেই মেটায়। অভ্যাসে বাঁধা মন কিছুটা অন্তত পায় অপ্রত্যাশিতের মধ্যে মুক্তি।

'এ মুক্তির পথ না থাকলে কী যে হতে পারে কিছুই বলা যায় না।

'কারণ, মানুষ যত সভ্যই হোক, আসলে সে যে ভয়ংকর দুর্দান্ত উন্মত্ত এক প্রাণী এ বিষয়ে কি কিছু সন্দেহ আছে!

'তার সভ্যতাও এক হিসেবে এই উন্মত্ততারই ফল। ভয়ংকর উন্মত্ততায় সে পশুত্বের সীমা পার হয়ে এসেছে। প্রকৃতি আর সব প্রাণীকে যে নির্দিষ্ট নিরাপদ নিশ্চিন্ত গণ্ডির মধ্যে বেঁধে দিয়েছে তা লঙ্ঘন করে এসেছে অসীম অনিশ্চয়তায়।

'মানুষের এ আদিম উদ্দামতা সারবার নয়। সারাতে চাওয়াও ভুল। শুধু বিভ্রাট যাতে না ঘটতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এ উদ্দামতাকে শুধু শাসনে রাখবার চেষ্টা করা যেতে পারে। এঞ্জিনের উদ্বৃত্ত বাষ্পবেগের জন্য যেমন সেফটি ভাল্‌ভ দরকার মানুষের বেলাতেও তেমনই। রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনি কি এক দিক দিয়ে এইরকম নিরাপদ ছিদ্র পথ নয়? আমাদের মনের দুরন্ত বাষ্পবেগকে কিছুটা মুক্তি দিয়ে সমাজ সংসারকে সর্বনাশা বিস্ফোরণ থেকে যা বাঁচায়!

'রহস্য রোমাঞ্চের কাহিনি আছে বলেই এ যুগের অধিকাংশ মানুষ নির্বিকারভাবে দুবেলা ছক বাঁধা ঘরে সাজানো ঘুঁটির মতো নড়ে একথা নিছক অতিশয়োক্তি বোধহয় নয়।

'রহস্য রোমাঞ্চের ডিটেকটিভ গল্পের স্বপক্ষে যেমন বিপক্ষেও তেমনই বলার কিছু নেই এমন নয়।

'যা নিয়ে তার কারবার সেই রহস্য বস্তুটিরই গূঢ় মর্ম তার যেন অজানা। পৃথিবীটা যে অসীম রহস্যময় একথা বোঝবার অতি সোজা পথ বলেই নিতান্ত ভুল পথই সে বেছে নিয়েছে।

'তার আর একটা মহৎ দোষ এই যে, দৃষ্টিশক্তি তার বড় ক্ষীণ। কাছের অত্যন্ত মোটা জিনিস ছাড়া আর কিছু তার নজরে পড়ে না। তার রংকানা চোখে লাল ছাড়া আর কোনও বর্ণ যেন দুনিয়ায় নেই। খুনোখুনি না হওয়া সত্ত্বেও আমাদের পাশের বাড়ি যে রূপকথার মায়াপুরীর চেয়ে রহস্যময় হতে পারে এ খবর সে জানে না। গোয়েন্দার চেয়েও অদ্ভুত অসংখ্য মানুষ যে প্রতিদিন রাস্তাঘাটে ভিড় করে থাকে সেকথা সে ভুলে গেছে। হত্যাকারীর চেয়ে দারুণ রহস্য যে আমরা প্রত্যেকে প্রতি মুহূর্তে নিঃশব্দে নিজেদের বুকে গোপন করে চলেছি এ সত্য তার অজানা।

উত্তেজনার জন্যে আদালত থানা লাশঘর থেকে কত দূর দুর্গমেই না সে গল্প ছুটে মরে, তবু সাহস করে অপরূপ পৃথিবীর সেই একটি বিস্ময়কর প্রান্তে কখনও পা বাড়ায় না যেখানে নিজেরা আমরা থাকি।'

বাংলা সাহিত্যে আরও অনেকে গোয়েন্দা গল্প লিখেছেন, কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রর গোয়েন্দা গল্পের অর্থাৎ পরাশরের গল্পের স্বতন্ত্রতা তিনটি বিশিষ্টতার উপর নির্ভরশীল। গোয়েন্দার চরিত্র, অপরাধীর চরিত্র আর রচনাশৈলীর চরিত্র এই তিন চরিত্রই লেখকের অনন্য সাহিত্যিকতায় বিশিষ্ট। পরাশর সাধনায় কবি, কিন্তু শখেতে গোয়েন্দা। অবশ্য ১৯৩২-এর পরাশর আর পঞ্চাশ কি ষাট দশকের পরাশরের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। মনে হয় প্রথম দিকের গল্পগুলিতে পরাশরের কবিসত্তা একান্ত অনিবার্যভাবে আর গোয়েন্দাসত্তা নিতান্ত ঘটনাক্রমে সক্রিয়। 'পরাশর বর্মা ও কবিতার ঘণ্ট' গল্পে পাশ্চাত্য প্রভাবে আধুনিক বাংলা কবিতা চর্চার প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ থেকে মনে হয় এটা প্রথম পর্যায়ের একটি গল্প। তিরিশের দশকের শেষ দিকে প্রেমেন্দ্র

যখন সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে মিলে 'নিরুক্ত' পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন তখন রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 'বর্তমান বাংলা কবিতায় কোথাও কোথাও যে নকল করা বাতুলতার হুজুগ চলছে, তাতে আপনার সহানুভূতি ও স্নেহ থাকতে পারে না বলেই আমার ধারণা।' পাশ্চাত্য কবিদের প্রতি কোনও কোনও বাঙালি কবির ভক্তির আধিক্যে প্রেমেন্দ্রর সুপরিজ্ঞাত বিরূপতা উল্লিখিত গল্পে বিশেষ ব্যঙ্গের রূপ লাভ করেছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পরাশরের গল্পগুলি থেকে তাঁর কাব্যচর্চার প্রসঙ্গ গৌণ আর গোয়েন্দাগিরির কথা মুখ্য হয়ে উঠেছে। অনুমান করা যেতে পারে যে চলচ্চিত্রের জন্য 'কালোছায়া', 'হানাবাড়ি', 'ডাকিনীর চর' প্রভৃতি কাহিনি লেখার পরেই পরাশরকে পুরোদস্তুর গোয়েন্দা হিসেবে গল্প লেখা শুরু করেন তিনি।

কবিতা লেখার চেয়ে গোয়েন্দাগিরিতে পরাশরের আগ্রহ-বৃদ্ধি সত্ত্বেও পরাশরের চরিত্রের মৌল পরিবর্তন হয় না, সব গল্পেই পরাশর আকস্মিকতায়, আপাতলঘুতায়, কৌতুকপ্রিয়তায়, কৌতূহলে, চরিত্রমাধুর্যে, প্রাণপ্রাচুর্যে এবং পরিস্থিতির তারতম্যে গাম্ভীর্যে ও রসবোধে যেমন আকর্ষণীয় তেমনই মনোহর। সর্বোপরি রয়েছে তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রখর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। জীবন বিপন্ন করে উত্তেজক রুদ্ধশ্বাস ঘটনার খরস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়া পরাশরের স্বভাবগত নয়, তবু কাহিনির প্রয়োজনে 'হার মানলেন পরাশরে' তেমন কাণ্ডকারখানাতেও পরাশরের তৎপরতা দেখা গেছে। কিন্তু এ রকম নজির খুবই কম। অপরাধী চরিত্র চিত্রণেও প্রেমেন্দ্রর প্রতিভার সম্যক স্ফুরণ দেখা যায়। সমস্ত গোয়েন্দা-গল্পেই অপরাধীকে চেনা কষ্টকর, প্রেমেন্দ্রর গল্পে আরও বেশি কষ্টকর। কারণ তাঁর অনেক গল্পেই অপরাধের আবহের মধ্যে বাস করেও অপরাধী অনায়াসে নিজের চারপাশে এক বিস্ময়কর সামাজিকতা ও শিষ্টশীলতার বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে রাখে এবং তেমন চরিত্রের আচ্ছাদন ছিন্ন করে পরাশর যখন অপরাধীর আসল চরিত্রকে টেনে বের করেন তখন পাঠকের মনে অপ্রত্যাশিতের প্রীতিকর চমক লাগে। মনুষ্যচরিত্র যে কী গভীর রহস্যে আবৃত তার অমোঘ উন্মোচনে প্রেমেন্দ্রর বিখ্যাত ছোটগল্পগুলির মতো পরাশরের গোয়েন্দা গল্পগুলিতেও বারবার প্রতিপন্ন হয়েছে তাঁর নিজস্ব শিল্পিত্ব। প্রেমেন্দ্রর সব গল্পেই তৃতীয় এক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এবং তা হল উপস্থাপনার গুণে, ভাষার ঐশ্বর্যে ও রচনাশৈলীর চাতুর্যে নিতান্তই সাহিত্যকীর্তি রূপে পাঠক-পাঠিকার সন্তোষ সম্পাদনের কৃতিত্ব। এ ছাড়া কোনও কোনও গল্পের তির্যক বর্ণনাভঙ্গি ও উজ্জ্বল যৌগিক বাক্যবিন্যাস রচনাগুলির অন্তর্গত গল্পবস্তুর রহস্যময়তা ব্যতিরেকেই বিশেষভাবে সাহিত্যের স্বাদে উপাদেয়। এইসব অবলোকনের স্বপক্ষে প্রচুর দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। সামগ্রিক বিচারে প্রেমেন্দ্রর গোয়েন্দা গল্পও অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টিই।

পরিশেষে একটি অপরাধের কথা স্বীকার করি যেটা পরাশরের পক্ষেও ধরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। অনির্বাণ প্রকাশনী প্রকাশিত 'ছবি চিনলেন পরাশর' বইটিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল মোট একুশটি পরিচ্ছেদ, ফলে বইটি হাতে নিলে মনে হত যেন একটাই গল্প। আসলে এতে ছিল দুটি গল্প, দীর্ঘ গল্পটির নাম অনুসারে বইটির নামকরণ হয়েছে, কিন্তু প্রথম পাঁচটি পরিচ্ছেদে যে-গল্পটি রয়েছে সেটির মূল নাম উদ্ধার করতে না পেরে গল্পটির নাম দিয়েছি 'দূরবিন হাতে পরাশর'। এই নিরুপায় হয়ে করা অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বড়দিন
২৫ ডিসেম্বর ২০০৩
কলকাতা ৭০০০৯২

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

AFSA FAMILY CUTTACK

সূ চি প ত্র

প রা শ র

গোয়েন্দা কবি পরাশর • ৩
ভয়ংকর ভাড়াটে ও পরাশর বর্মা • ৬
সাংঘাতিক শিশি ও পরাশর বর্মা • ১৩
পরাশর বর্মা ও অশ্লীল বই • ২৫
চেঞ্জে গেলেন পরাশর বর্মা • ৩৭
পরাশর বর্মা ও বাঁধানো ছবি • ৪৪

pathagar.net

আর্কপ্রুফ
বই নং
তারিখ

গোয়েন্দা কবি পরাশর

হ্যাঁ, সেই পরাশর বর্মার কথাই বলছি, যার নাম শুনলে কান খাড়া হয়ে ওঠে না এমন ছেলে-মেয়ে, জোয়ান-বুড়ো কোথাও আজ আছে কি না সন্দেহ। সারা দুনিয়ায় যাঁর গোয়েন্দাগিরির কীর্তিতে বাঙালি হিসেবে আমাদের বুক দশ হাত।

সেই পরাশর বর্মার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় যেখানে যেভাবে হয়, রহস্য-রোমাঞ্চের জগতের সঙ্গে তার সুদূর সংস্রবও নেই। আমার নাম ধরুন কৃত্তিবাস ওঝা। নাতিপ্রসিদ্ধ একটি মাসিক পত্রিকার তখন আমি সম্পাদনা করি। সেই অফিসে একদিন বিকালে অত্যন্ত সাদাসিদে পোশাকের এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। মাসের শেষ—কাগজ বার করবার তাড়ায় মাথার ঘায়ে তখন কুকুর পাগল হবার জোগাড়। ভদ্রলোকের দিকে দৃষ্টি দেবার ফুরসতও তখন পাইনি। তা ছাড়া মাসিকপত্রে কবিতা-গল্প ছাপাবার জন্য সাহিত্য-যশোপ্রার্থী এরকম এতজনের আবির্ভাব হামেশা হয় যে আগে থাকতে খবর না দিয়ে কাউকে আসতে দিতে আমার বেয়ারাদের বিশেষভাবে মানা করা আছে। বিশেষ একটা গোলমালের দরুন তখন মাথা বিগড়ে না থাকলে ভদ্রলোককে বিনা অনুমতিতে কেন ঢুকতে দেওয়া হয়েছে তাই নিয়ে হয়তো বেয়ারাদের কৈফিয়ত তলব না করে ছাড়তাম না। কিন্তু তখন সে খেয়াল ছিল না। সকালবেলার ছাপা কাগজের একটি ফর্মা দেখে তখন সমস্ত রক্ত আমার মাথায় উঠে গেছে। সে ফর্মায় এমন একটি লেখা ছাপা হয়ে গেছে যা বেরোলে আমার কাগজের কলঙ্কের আর সীমা থাকবে না। এমনকী মানহানির দায়ে পর্যন্ত পড়া অসম্ভব নয়। বাংলা দেশের কোনও এক অপরাজেয় লেখকের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যক্তিগত আক্রমণ ছাড়া সে লেখা আর কিছু নয়; যাকে বলে কাঁচা খেউড়, তাই দিয়ে কে একজন ছদ্ম-নামের লেখক তাঁর ওপর গায়ের ঝাল মিটিয়েছে। কে এ কপি ছাপতে দিয়েছে, কে দিয়েছে প্রিন্ট অর্ডার, সেই কথাই রেগে আগুন হয়ে আমাদের প্রিন্টার মনোমোহনকে জিজ্ঞাসা করছিলাম।

মনোমোহন কিন্তু একেবারে ভেজা তুলসী পাতাটি। বললে, 'আজ্ঞে আমি আর লেখার ঝাল-টক কী বুঝি বলুন, যা দেন তাই ছেপে দিই!'

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলাম, 'যা দিই তাই ছেপে দাও? এ লেখার প্রিন্ট-অর্ডার আমি দিয়েছি বলতে চাও?'

'আজ্ঞে আপনি না দিলে আর কে দেবে? আপনার অর্ডার ছাড়া ছাপব ঘাড়ে আমার অমন একটার বেশি দুটো মাথা তো নেই!'

মনোমোহনের কথা একবার শুরু হলে আর থামবে না জানি। তাই ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'কই নিয়ে এসো দেখি আমার প্রিন্ট অর্ডার।'

'আজ্ঞে সঙ্গে করেই এনেছি' বলে মনোমোহন আমার সই করা কাগজের তাড়াটা টেবিলের ওপর আমার সামনে ফেলে দিলে।

তুলে নিয়ে আমি একেবারে থ। এ তো সত্যি আমারই সই! কাজের ভিড়ে কখন তাড়াতাড়িতে সই করে দিয়েছি আমার খেয়ালই নেই। ভাগ্যে সময় থাকতে লেখাটা চোখে পড়েছিল, নইলে কাগজের সঙ্গে বাজারে বেরিয়ে গেলে আর কোনও উপায়ই থাকত না। এখন

শুধু কম্পোজ ও ছাপাবার মজুরিটুকু লোকসান দিয়েই কোনওরকমে মান বাঁচানো যাবে।

বাজারে মান বাঁচলেও মনোমোহনের কাছে বেশ একটু অপ্রস্তুত বোধ করছিলাম। তার দিকে না চেয়েই বললাম, 'আচ্ছা এখন যাও, এ ফর্মা আবার নতুন করে ছাপতে হবে। আমি কপি এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

মনোমোহনের দিকে না তাকালেও বুঝতে পারছিলাম বেশ একটু জয়ের হাসি হেসে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ শুনলাম, 'ওহে একটু শোনো তো!'

সামনের ভদ্রলোকের কথা একেবারে ভুলেই গেছলাম। তাঁর এই মাতব্বরিতে একটু বিস্মিত ও বিরক্তই হলাম। আমার প্রিন্টারকে হুকুম করবার তিনি কে? বিরক্তি গোপন না করেই বললাম, 'কেন বলুন তো? ওকে ডাকছেন কেন?'

ভদ্রলোক মৃদু একটু হেসে বললেন, 'আপনার প্রিন্ট অর্ডারের সইটা একটু দেখব।'

'আপনি সই দেখবেন! তার আগে আপনার পরিচয়টা জানতে পারি? আপনি সিগ্নেচার এক্সপার্ট নিশ্চয় নন!'

আর কেউ হলে আমার গলার স্বরেই নিজের জায়গা যে কোথায় বুঝে অনধিকার চর্চায় আর মাথা গলাত না। কিন্তু ভদ্রলোকের গায়ের চামড়া বেশ পুরু মনে হল। আমার গলার ঝাঁজ বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে নির্বিকারভাবে তিনি বললেন, 'এক্সপার্ট না হলেও, আপনাকে এ বিষয়ে কিছু সাহায্য বোধহয় করতে পারি।'

মনোমোহন তখন দরজার কাছে ফিরে দাঁড়িয়েছিল। ভদ্রলোকের দৌড় কতদূর দেখবার জন্যই বিদ্রুপের স্বরে বললাম, 'নিয়ে এসো মনোমোহন তোমার কাগজটা। দেখি শার্লক হোমস কী বার করেন ও থেকে!'

মনোমোহন অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে কাগজটা টেবিলে এনে রাখবার পর ভদ্রলোক সেটা তুলে নিয়ে একবার আমার সইয়ের ওপর চোখ বুলিয়েই মৃদু হেসে শুধু বললেন, 'হুঁ!'

তিক্ত বিদ্রুপের সঙ্গে বললাম, 'দেখা আপনার হয়ে গেল এরই মধ্যে?'

ভদ্রলোক তেমনই ঈষৎ হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, দেখবার তো বেশি কিছু নেই, আমি শুধু কালিটা দেখতে চেয়েছিলাম।'

'ও, শুধু কালিটা দেখতে চেয়েছিলেন! তা হলে হাতের লেখা নয়, আপনি কালি সম্বন্ধে এক্সপার্ট! তা কালি দেখে কী বুঝলেন, জানতে পারি কি?'

'আপনি সত্যি তা শুনতে চান?'

ভদ্রলোকের মুখের সেই হাসি দেখে গা আরও জ্বলে গেল। বললাম, 'আপনার কেরামতিটা একটু দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে বই কী! অবশ্য যদি বলবার মতো আপনার কিছু থাকে!'

ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে আবার একটু হাসলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তা হলে শুনুন, ও সই আপনার নয়!'

'আমার নয়!' উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বললাম, 'আমার চেয়ে আপনি আমার সই বেশি চেনেন দেখছি। শুধু কালি দেখেই এত বড় একটা আবিষ্কার করে ফেললেন বোধহয়!'

ভদ্রলোক আবার তেমনই গা-জ্বালানো হাসি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, কালিটাও একটা প্রমাণ বই কী!'

'কিন্তু আপনার তা হলে জানা দরকার যে আমি সবুজ কালি ছাড়া ফাউন্টেন পেনে কিছু ব্যবহার করি না।'

'তা জানি। এবং সেই জন্যেই বলছি যে ও সই আপনি করেননি।'

এবার বেশ একটু রেগেই বললাম, 'দেখুন, প্রলাপ শোনবার সময় ও ধৈর্য আমার নেই। সইটা স্পষ্ট দেখছেন সবুজ কালিতে করা, আমি আপনাকে বলছি যে সবুজ কালি ছাড়া আমি কিছু ব্যবহার করি না, তবু আপনি বলছেন, সবুজ কালিতে বলেই ও সই আমার নয়! হেঁয়ালিটা হয়

পরিষ্কার করে বলুন, নয় অনুগ্রহ করে কাজের সময় বিরক্ত করবেন না।'

ভদ্রলোক আমার রাগটা যেন উপভোগ করেই বললেন, 'না, আপনাকে বিরক্ত করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। তবে হেঁয়ালি যাকে মনে করছেন, সেটা নেহাত সহজ সরল ব্যাপার। কাল আপনি ফাউন্টেন পেনটা অফিসে আনেননি মনে আছে?'

'ফাউন্টেন পেন আনিনি?' সত্যিই প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলাম, তারপর কথাটা মনে পড়ায় অবাক হয়ে বললাম, 'আপনি কী করে জানলেন?'

'যেমন করে জানলাম, আপনি সবুজ কালি ব্যবহার করেন, যেমন করে জানলাম, কাল ও কাগজে সই আপনি করেননি।'

আবার একটু উষ্ণ হয়ে উঠে বললাম, 'কী থেকে জানলেন, তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

'কিছু মনে করবেন না, জানলাম, আপনি অত্যন্ত অগোছালো অপরিষ্কার ঢিলে স্বভাবের বলে।'

নিজের অফিসঘরের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ভদ্রলোকের কথাটার আর প্রতিবাদ করতে পারলাম না। ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'কাগজের অফিস হয়তো এই রকমই হয়, তবু আপনার অফিসে পরিচ্ছন্নতার কোনও বালাই নেই, এ কথা আপনি বোধহয় অস্বীকার করতে পারবেন না। আপনার ব্লটিং প্যাডটাই দেখুন না, সাত দিন অন্তত এটা বদলানো হয়নি—'

ব্লটিং প্যাডটা এবার তুলে নিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি যে সবুজ কালি ছাড়া কিছু ব্যবহার করেন না, এই ব্লটিং প্যাডটা দেখলেই তা বুঝতে দেরি হয় না। আগাগোড়াই এটার গায়ে সবুজ ছাপ, শুধু কয়েকটা জায়গায় কালো কালির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এ কালো কালির চিহ্ন কোথা থেকে এল? ব্লটিঙের ছাপেও লেখার খানিকটা ধাঁচ পাওয়া যায়। সেই ধাঁচ থেকে ও এ ঘরে আপনি ছাড়া কেউ বসেন না জেনে বোঝা যাচ্ছে, এ কালো কালির লেখাও আপনার। কিন্তু কবে আপনি হঠাৎ কালো কালি ব্যবহার করলেন সবুজ কালি ছেড়ে? ব্লটিংটা লক্ষ করলেই দেখা যাচ্ছে কালো কালির ছাপ সব জায়গাতেই সবুজের ওপর পড়েছে, কালোর ওপর কোথাও সবুজ পড়েনি। সুতরাং হয় আজ নয় কাল সবুজ কালির বদলে আপনি কালো কালি ব্যবহার করেছেন। আজকে আপনার পকেটে ফাউন্টেন পেন দেখা যাচ্ছে। সুতরাং কালো কালির লেখাগুলো নিশ্চয়ই কালকের। দু-দিন উপরি-উপরি আপনি কালো কালি ব্যবহার করেছেন একথাও ভাবতে পারতাম, কিন্তু ব্লটিঙের ওপর কালো কালির সামান্য যে ছাপ আছে, মাসিক কাগজের সম্পাদকের দু'দিনের লেখার পক্ষে তা অত্যন্ত কম।'

আমি ভদ্রলোককে একটা কথা বলবার জন্যে বাধা দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি আমায় যেন গ্রাহ্য না করেই বলে চললেন, 'আপনি যে কাল ফাউন্টেন পেন আনেননি, তার আরও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে আপনার জামায়। আপনি অগোছালো ঢিলে স্বভাবের লোক না হলে এ প্রমাণ পাওয়া যেত না। আপনার বুকপকেটে সবুজ কালির বেশ খানিকটা ছোপ পড়েছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ফাউন্টেন পেন লিক করে কালি জামায় লেগেছে। কিন্তু কালিটা শুকিয়ে গেছে। জায়গাটা ভিজে নয়। সুতরাং কলম আপনার আজকে লিক করছে না। করেছে আগেই। কাল যখন আপনি কালো কালিতে লিখেছেন, তখন বোঝা উচিত যে কলমটা পরশুই লিক করেছিল, সেই জন্যে কলমটা কাল আপনি আনেননি। আজ আবার যখন নির্ভয়ে সেটা বুকে বয়ে এনেছেন, তখন হয় লিক সারানো হয়েছে ইতিমধ্যে, কিংবা খালি কলমটা সারাতে দেবার জন্যেই এনেছেন।'

এবার জোর করে ভদ্রলোককে থামিয়ে বললাম, 'আপনার পর্যবেক্ষণ ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি দেখে অবাক হলাম, কিন্তু সইটা আমার নয় কী করে বুঝলেন?'

ভদ্রলোক হেসে উঠে বললেন, 'আগেই তো বলেছি, সইটা সবুজ কালিতে বলে। সবুজ কালি দেখেই সইয়ের তারিখটা আপনি নিজেই লক্ষ করতে ভুলে গেছলেন। তারিখটা কালকের। এবং কাল আপনি যে কলম ও কালি ব্যবহার করেছিলেন, তা হচ্ছে এই। সুতরাং

ও সই আপনার হতে পারে না।'

ভদ্রলোক টেবিলের ওপরকার দোয়াতদানি ও কলমটা দেখিয়ে দেবার পর সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে বললাম, 'আশ্চর্য! এ কথাটা আমার মনেই হয়নি।'

ভদ্রলোক দোয়াতদানি থেকে কলমটা তুলে নিয়ে বললেন, 'কলমটায় একেবারে নতুন একটা নিব পরানো রয়েছে দেখা যাচ্ছে। নিবের মুখে সামান্য যেটুকু কালি লেগে রয়েছে, তাতেও বোঝা যায় বেশি কিছু লেখা এ কলম দিয়ে এখনও হয়নি। ফাউন্টেন পেনে লেখা যাঁর অভ্যাস, বোঝা যাচ্ছে শুধু দায়ে পড়ে তিনি একদিনের জন্যে এই ব্যবস্থা করেছিলেন। এই কপি আপনার অজ্ঞাতে কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া যার উদ্দেশ্য, সে আপনার সই জাল করবার সময় সব দিকে হুঁশিয়ার হয়েও শুধু ভাগ্যের কারসাজিতে একটা কাঁচা কাজ করে ফেলেছিল। বরাবর আপনি সবুজ কালিতে লেখেন, হঠাৎ কালই আপনার কলম খারাপ হবে সে কী করে আর জানবে!'

ভদ্রলোকের দিকে খানিক বিমূঢ়ভাবে চেয়ে থেকে এবার বললাম, 'আপনার নামটা কী জানতে পারি কি?'

'আমার নাম পরাশর বর্মা!'

'পরাশর বর্মা! ও! কিন্তু দেখুন, সি. আই. ডি ডিপার্টমেন্টের হঠাৎ আমার ওপর সুনজর হল কেন বুঝতে পারছি না তো!'

পরাশর বর্মা হেসে বললেন, 'আমি সি. আই. ডি নই। আপনি ভাবনা করবেন না।'

'সত্যি আশ্চর্য হলাম। এখন বলুন, আপনার জন্যে কী করতে পারি!'

পরাশর বর্মার মুখের চেহারা এক মুহূর্তে যেন বদলে গেল। কোথায় গেল সেই সপ্রতিভ আত্মবিশ্বাসের সহজ ভঙ্গি, এক মুহূর্তে একেবারে অত্যন্ত লাজুকের মতো অপ্রস্তুতভাবে পকেট থেকে একটি কাগজের তাড়া বার করে বললেন, 'আমার কয়েকটা কবিতা আপনাকে দেখাতে এনেছিলাম। যদি অবশ্য আপনার সময় থাকে।'

সত্যি আকাশ থেকে পড়ে বললাম, 'আপনি—আপনি কবিতা লেখেন!'

পরাশর আর যেন চোখ তুলে তাকাতেই পারেন না। মাথা নিচু করে বললেন, 'ওই আমার জীবনের একমাত্র সাধনা।'

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। পরাশর বর্মার হাত থেকে কাগজের তাড়াটা নিয়ে বললাম, 'এগুলো কিন্তু আমার কাছে আপনাকে রেখে যেতে হবে। সময় মতো দেখব।'

'নিশ্চয়, তাই আপনি দেখবেন। আর যদি দু-একটা তেমন—'

বাধা দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, তেমন ভাল হলে নিশ্চয়ই ছাপব।'

পরাশর এবার উঠে পড়ে বললেন, 'আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না।'

সঙ্গে সঙ্গে আমিও দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, 'দেখুন, হতভম্ব যা করে গেলেন তাতে বিরক্ত হয়েছি কি না বুঝতেই পারছি না। ডাক্তার কবি, ইঞ্জিনিয়ার কবি, উকিল কবি অনেক শোনা গেছে, কিন্তু গোয়েন্দা কবি বোধহয় এই প্রথম দেখলাম।'

পরাশরের মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'গোয়েন্দাগিরিটা আমার শখ, কিন্তু কাব্য আমার সাধনা।'

বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরাশর বর্মার কবিতাগুলি তারপর সাগ্রহে পড়ে দেখেছি।

ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ছাড়া তাদের আর কোথাও জায়গা নেই।

ভয়ংকর ভাড়াটে ও পরাশর বর্মা

বাড়ি খুঁজে বের করে ভেতরে গিয়ে বসতে না বসতেই প্রথম কবিতার খাতার চাপে দম বন্ধ হবার জোগাড়। একটি দুটি নয়, পাঁচ-পাঁচটি মোটা বাঁধানো খাতা, আর প্রত্যেকটি খাতা আগাগোড়া কবিতায় ঠাসা।

প্রথম খাতা খুলে প্রথম কবিতা পড়েই চক্ষুস্থির।

কবিতাটির নমুনা :

যদি বলো, মাঝ রাতে ঘুম যেই ভেঙে যায়
ছটফট করো শুধু বিছানায়
আমি বলি ভাবনা কী?
ঘুম যদি নাহি আসে—
ছাদে গিয়ে দাঁড়াও না খাড়া পায়।
দেখবে শহর ঘুমে মগ্ন
দূরে কোথা গাড়ি চলে যাচ্ছে
ঠিক যেন মাঝে মাঝে
চিত হয়ে শুতে গিয়ে ঘড় ঘড় নাক তার ডাকছে।
বিছানায় নিঃসাড়ে ছারপোকা মশারা
যেভাবে কামড় দিতে ব্যস্ত
চোর, বাটপাড় আর বদমাশ যেথা যত—
কোথা নেই কেউ অলস তো।
আহা কীবা মনোহর
তারাদের ঝিকমিক
মনে হয় আকাশেতে কারা করে পিকনিক।
আমি তাই বলি মিছে
যেও নাকো ঘাবড়িয়া
মাঝে মাঝে মন্দ কী
হলে ইনসোমনিয়া!

পৃষ্ঠা নং
কবিতা
pathagar.net

কবিতাটি শেষ করে খাতা থেকে মুখ তোলার আগেই লেখকের সলজ্জ মন্তব্য শোনা গেল, 'আমি একটু আধুনিক ধরনেই লিখি, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'

যাঁরা এ লেখা পড়ছেন, তাঁরাও এতক্ষণে বোধহয় বুঝেছেন যে, এ কবিতার লেখক পরাশর বর্মা ছাড়া আর কেউ নয়। নিজের গরজে তাঁরই বাড়ি খুঁজে আজ সকালে এসে পৌঁছোবামাত্র তিনি আনন্দে এমন গদগদ হয়ে উঠেছেন যে আসল কথাটা বলবার এখনও সময় পাইনি।

খিদিরপুরের একটি গলির ভেতর বাড়ি। দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তেই হঠাৎ একেবারে কানের কাছে ভারী গলায় 'কাকে চান?' শুনে চমকিয়ে উঠেছি।

কাছে-পিঠে তো কেউ নেই!

এ অশরীরী ধাক্কাতেই মুখ থেকে আপনা হতে বেরিয়ে গেছে, 'আজ্ঞে, পরাশর বর্মাকে।'

'নাম বলুন আপনার!' আবার সেই ভুতুড়ে আওয়াজ।

নামটা বলার পরই দরজাটা যেন মন্ত্রবলে খুলে গেছে। কিন্তু ওধারেও তো কেউ নেই।

সত্যিই ঢুকব, না, এইখান থেকেই সরে পড়ব ভাবছি, এমন সময় ভেতরের ঘর থেকে স্বয়ং পরাশর বর্মাই বেরিয়ে এসেছেন।

'আরে আসুন, আসুন। আমার কী সৌভাগ্য!' পরাশর বর্মার কণ্ঠে সাদর অভ্যর্থনা।

ভুতুড়ে আওয়াজের অস্বস্তিটা তখনও কাটাতে পারিনি। সন্দিগ্ধ ভাবে পেছনে একবার তাকিয়ে তাঁর পিছু পিছু ভেতরের ঘরে গিয়ে ঢোকবার পথে জিজ্ঞাসা করেছি, 'ব্যাপারটা কী বলুন তো! এসব ভুতুড়ে কাণ্ড কারখানার মানে কী?'

'ভুতুড়ে!' প্রথমে একটু অবাক হয়ে পরাশর বর্মা হেসে উঠেছেন। 'আরে না, ভুতুড়ে হবে কেন? চাকর বাকর পাওয়া আজকাল কী রকম শক্ত জানেন তো, তাই একটু বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা করতে হয়েছে।' বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার পরিচয় তাঁর বাড়িতে তারপর আরও অনেক পেয়েছি। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আজ থাক।

যেখানে তারপর ঢুকেছি, সাদাসিধে ভাবে সাজানো সেটি সাধারণ বসবার ঘর। শুধু চেয়ার টেবিলের বদলে দেশি ধরনের নিচু গদি দেওয়া বসবার আসন।

তার একটিতে বসতে না বসতেই কবিতার আক্রমণ শুরু হয়েছে। পরাশর বর্মা এই ঘরে বসেই বোধহয় কাব্যচর্চা করছিলেন। ঘরটার চারদিকে আমার চোখ বোলানো শেষ হতে না হতেই দেখি সামনে বাঁধানো খাতাগুলি উপস্থিত।

পরাশর প্রথম খাতাটি তুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলেছেন, 'আপনি নিজে থেকে আমার খোঁজ করতে আসবেন ভাবতেই পারিনি। কিন্তু এসেছেন যখন তখন আপনাকে সব না পড়িয়ে ছাড়ছিনে। কী খাবেন বলুন, চা না কফি?'

বিমূঢ়ভাবে খাতাগুলির দিকে চেয়ে চা না কফি, কীসে সায় দিয়েছি মনে নেই।

ভদ্রতার খাতিরে প্রথম খাতাটা হাতেও তুলে নিতে হয়েছে।

তারপর নামাবার অবসর আর পাইনি।

একেবারে কবিতার শিলাবৃষ্টি সমানে চলেছে।

প্রথমটির নমুনা আগেই দিয়েছি। আরও একটি না তুলে দিয়ে পারছি না। পরাশর বর্মার এটি নাকি অত্যন্ত প্রিয় কবিতা। কবিতার নাম 'পকৌড়ি'। পকৌড়ি নিয়ে কোনও সাহিত্যে আধ্যাত্মিক কবিতা অন্তত কেউ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই।

পকৌড়ি তুমি অতি তুচ্ছ,
আশা তব নয় মোটে উচ্চ,
কী তেলে যে ভাজা হও নাই তব পরোয়া,
তবু তব স্বাদ কভু পায় নাকো ঘরোয়া
তেলেভাজা বেসন কি ডালবাটা যা-ই হোক।
তুমিই সুলভতম রসনার সম্ভোগ।
ও স্বাদের রহস্য কীসে কোন মশলায়
জানলে এ দুনিয়ার সব গোল মিটে যায়।
রাস্তার ধুলো সে কি, সকলের মাড়ানো?
ভেজাল তেলের গুণ, বার বার পোড়ানো?
শুধু তাই নয় আরও আছে বিশেষত্ব
জনগণমন দিয়ে খুঁজি সেই তত্ত্ব।

কবিতার স্রোতে যখন হাবুডুবু খাচ্ছি, এমন সময় কফি এল। এবার আর ভৌতিক কায়দায় নয়, রক্ত মাংসের চাকরের হাতে কাঠের ট্রের উপরে।

কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে একটু ফাঁক পেয়ে আসল কথাটা পাড়লাম, 'আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছিলাম পরাশরবাবু।'

'ঠিক আছে। তার জন্যে কিছু ভাববেন না। যে ক-টা কবিতা আপনার পছন্দ হয়, সব আপনি নিয়ে যেতে পারেন!' বলে পরাশর বর্মা আবার কবিতা পড়বার উপক্রম করলেন।

সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, 'আজ্ঞে কবিতা, তা তো নেবই, কিন্তু তার আগে আমার কথাটা যদি একটু শোনেন! একটা রহস্যের কিনারা করতে আপনার সাহায্য চাই।'

'বেশ তো, বেশ তো! কী রহস্যটা বলেই ফেলুন না!' বলে পরাশর বর্মা ভরসা দিলেন।

কিন্তু ওই ভরসা পর্যন্তই। তাঁর আর একটি কবিতা পড়া তখন শুরু হয়ে গেছে।

উপায় নেই। তাই ওই কবিতার ফাঁকে ফাঁকেই কোনওরকমে ঘটনাগুলো তাঁকে জানালাম। তাঁর কানে কথাগুলো গেল কি না তাই সন্দেহ।

ফল যে কিছু হবে সে আশা তখন আর নেই। মনে মনে এই কাব্য-পাগলা মানুষটার কাছে রহস্যের মীমাংসা করাতে আসাটাই আহাম্মকি হয়েছে বলে নিজেকে তখন দোষ দিচ্ছি। কবে কী সামান্য একটা রহস্যের কিনারা করেছিল বলে তার বুদ্ধিসুদ্ধি সম্বন্ধে অত উঁচু ধারণা করাই অন্যায় হয়েছে মনে হচ্ছিল।

রহস্যের মীমাংসার আর দরকার নেই। এ লোকের হাত থেকে ছাড়া পেলেই এখন বাঁচি।

নিজের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর ভদ্রতার খাতিরে আরও ঘণ্টাখানেক কবিতা শুনে মাথা যখন ঝিমঝিম করছে, তখন একটু ফাঁক পেয়ে বললাম, 'আজ আবার একটু কাজ আছে পরাশরবাবু, তাই এখন না উঠলে নয়।'

বেশ একটু হতাশ হয়ে পরাশর বর্মা বললেন, 'এখুনি উঠবেন! কিন্তু সবে তো একটি খাতাই মোটে শেষ হয়েছে।'

সভয়ে অন্য খাতাগুলোর দিকে চেয়ে বললাম, 'একটা খাতাতেই যা পেলাম তাই আগে সামলাই দাঁড়ান। এত ভাল জিনিস সব একসঙ্গে হজম করতে পারব না যে!'

কথাটার মধ্যে বিদ্রূপের সুরটা খুব প্রচ্ছন্ন ছিল না। কিন্তু পরাশর বর্মা খুশি হয়েই বললেন, 'তা ঠিক বলেছেন, আবার একদিন শোনানো যাবে, কী বলেন?'

আমার উৎসাহের অভাবটা লক্ষ না করেই পরাশর বর্মা আবার বললেন, 'কিন্তু আপনার রহস্যের কিনারাটা তো করে ফেলতে হয়।'

এবার অসন্তোষটা গোপন না করেই বললাম, 'না থাক, তার আর দরকার নেই।'

পরাশর বর্মা এবারও উলটো বুঝলেন। যেন প্রসন্ন হয়েই বললেন, 'ও, নিজেই এর মধ্যে মীমাংসা করে ফেলেছেন বুঝি। করে ফেলাই অবশ্য উচিত। রহস্যটা এমন কিছু নয়।'

'এমন কিছু নয়!' রাগব না অবাক হব বুঝতে না পেরে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বললাম, 'রহস্যটা কী, না জেনেই বলছেন—এমন কিছু সেটা নয়!'

'বাঃ—' পরাশরই এবার যেন অবাক। 'রহস্যটা না জেনে কী রকম! আপনি এতক্ষণ ধরে বললেন কী তা হলে?

'আমি তো বলেছি। কিন্তু আপনি তো নিজের কবিতা পড়াতেই মত্ত। শুনেছেন আমার কথা কিছু?'

'শুনিনি মানে!' এবার পরাশর হাসলেন, 'আচ্ছা, আমিই তা হলে ব্যাপারটা বলি, আপনি মিলিয়ে নিন ঠিক হচ্ছে কি না! ব্যাপারটা সংক্ষেপে হল এই—আপনাদের পাড়ায় একটি বাড়ি আছে। পুরনো ভাঙা বাড়ি, কিন্তু বছর দু-এক আগে এক অবাঙালি ভদ্রলোক সেটা কিনে মেরামত করিয়ে প্রায় নতুন করে তোলেন। ভদ্রলোকের নাম এস কাউল। তাঁর কোনও কুলে

কেউ আছে বলে আপনারা জানতে পারেননি। ভদ্রলোক একাই বাড়িতে থাকতেন। সঙ্গী শুধু একটি কুকুর। কাউল সাহেব খুব মিশুক লোক নয়। পাড়ায় কারও সঙ্গে বিশেষ আলাপ পরিচয় তাই তিনি করতেন না। তবে মাঝে মাঝে বাড়িতে খুব জাঁকজমক করে উৎসব খাওয়াদাওয়ার ব্যাপার হত। হোমরাচোমরা বড়লোক, ব্যবসাদার, কারখানার মালিকরাই সাধারণত আসতেন। বড় বড় গাড়িতে রাস্তা ভরতি হয়ে যেত। নাচ-গানের ব্যবস্থাও থাকত। আপনারাও কেউ-কেউ এইসব উৎসবের দু-একটিতে নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। অত লোকের ভিড়ের মধ্যে কাউল সাহেবের সঙ্গে বিশেষ আলাপের সুযোগ হয়নি। কিন্তু তাঁর নিজের সাজগোজ থেকে তাঁর বাড়ির সবকিছু ব্যবস্থার মধ্যে তাঁর রুচির পরিচয়, তাঁর অমায়িক ব্যবহার, বিশেষ করে রেশমি পাকা চুল দাড়ির ভেতর দিয়ে তাঁর মুখের সৌম্য প্রসন্নতা আপনাদের ভাল লেগেছে। কথা তাঁর মুখে খুব কমই শুনেছেন, শুধু বাংলা বলতে পারতেন না বলে নয়, ভদ্রলোক কথাই বলতেন কম।

বাড়িটা তখনই আপনাদের অদ্ভুত লাগত।

উৎসব হয়ে যাবার পরদিন সকালেই আবার সব নিঝুম। মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক ছাড়া বহুকাল আর তারপর সেখানে কোনও সাড়াশব্দই পাওয়া যেত না। মনে হত উৎসবটাই যেন স্বপ্ন। ওই ভুতুড়ে গোছের নির্জন বাড়ি যে একরাত্রে আলোয় ঝলমল মানুষ-জনে গমগম করে উঠেছে, তখন বিশ্বাসই হতে চাইত না।

মাঝে মাঝে কাউল সাহেবকে বাড়ি থেকে বেরোতে কি বাড়িতে ঢুকতে অবশ্য দেখা যেত। বাড়ির দরজার সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে দরজায় তালা দিয়ে তিনি শুধু একটি ছড়ি হাতে ট্যাক্সিতে উঠে কোথায় যে যেতেন আপনারা জানেন না।'

পরাশর বর্মা একটু থামতেই সবিস্ময়ে বললাম 'আশ্চর্য!'

পরাশর একটু হেসে বললেন, 'আশ্চর্যটা কী? সব কথাই আপনার শুনেছি, এই তো! দাঁড়ান আগে বাকি সবটা মেলে কি না দেখুন!'

পরাশর বলতে শুরু করলেন আমায় থ বানিয়ে, 'শেয়ার মার্কেট বা ওইরকম কোনও জায়গায় যে তিনি যেতেন, এইটে আপনারা অনুমান করতেন মাত্র! এ নিয়ে বিশেষ মাথা কেউ ঘামায়নি। দরকারও হয়নি। একদিন শুধু পাড়ার ছেলেরা ওই বাইরের দরজাতেই সরস্বতী পুজোর চাঁদার জন্যে তাঁকে ধরেছিল। তিনি কড়কড়ে একটি একশো টাকার নোট এতটুকু দ্বিধা না করে চাঁদা হিসেবে দিয়ে যথারীতি দরজায় তালা দিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে চলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু একদিন হঠাৎ সেই যে দরজায় তালা দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেছেন আর ফেরেননি। তাঁকে বাড়ি থেকে বেরোতে অবশ্য কেউ দেখেনি, কিন্তু পর পর কয়েকদিন দরজার সামনে বন্ধ তালা ঝুলতে দেখে আপনাদের কেমন আশ্চর্য লেগেছে।

কাউল সাহেব গেলেন কোথায়?

দিনের বেলায় যে যার নিজের ধান্দায় থাকেন, অত খেয়াল থাকে না। কিন্তু রাত্রে সেই বাড়ির ভেতর থেকে কুকুরের ডাক শুনে হঠাৎ মনটা সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। কাউল সাহেবের হল কী?

দিন কয়েক এমনই কাটবার পর পাড়ার অনেকেই একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু করবার তো কিছু নেই। তালা ভেঙে পরের বাড়িতে তো ঢোকা যায় না। যা রাগী কুকুর, সেটা নিরাপদও হবে না। আর পুলিশে খবর দেবার মতো কিছু হয়েছে কি না তা-ও তখনও বুঝতে পারছেন না।

একটা কিছু কিন্তু করা দরকার আপনাদের মনে হল। আপনাদের ছাড়া আরও অনেকের যে তা মনে হয়েছে পরের দিন বুঝতে পারলেন। ছুটির দিন। পরের পর বড় বড় মোটর আসে আর দরজায় তালা দেখে হতাশ হয়ে চলে যায়। কেউ কেউ আপনাদের কাছে খোঁজখবরও নিলে। আপনারা কি আর জানেন যে বলবেন। আপনারাই বরং শুনে অবাক হলেন যে যারা এসেছে তাদের অধিকাংশই পাওনাদার। শুনলেন যে অনেকেই নাকি কাউল সাহেবের কাছে অনেক পায়। ফাটকা-বাজারে কাউল সাহেব নাকি বড় দাঁও মারতে গিয়েই কাত হয়ে গা ঢাকা

দিয়েছেন। পাওনাদাররা নাকি একজোট হয়ে তাঁর বাড়িটা নিলামে তোলবার ব্যবস্থা করছেন—এ-ও ক-দিন বাদে শুনলেন।

কিন্তু বাড়ি নিলামে আর উঠল না। কাউল সাহেব উধাও হবার হপ্তাখানেক বাদেই একদিন দেখেন বাড়ির বাইরের দরজার তালা খোলা। ভেতরে মিস্ত্রি লেগেছে আবার বাড়ি মেরামত আর চুনকাম করতে।

ব্যাপার কী! কে এলেন আবার এ বাড়িতে?

আপনাদের কৌতূহলী হয়ে বেশিক্ষণ থাকতে হল না। বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে না যেতে বাড়ির নতুন মালিক নিজেই গায়ে-পড়া হয়ে এসে আলাপ করলেন আপনাদের সঙ্গে। মনে হল বেশ মিশুক। খালি গায়ে ধবধবে পইতের সঙ্গে কাঁধে গামছা ফেলা। পরনে আটহাতি খাটো ধুতি, পায়ে খড়ম। বেলের মতো চাঁছাছোলা মাথা ভরতি টাক, কামানো গোল মুখের সঙ্গে যেন মানানসই করে তৈরি। কথায় একটু রাঢ় দেশের টান। ভদ্রলোক নিজে থেকেই আলাপ পরিচয় করেছেন ও সারাক্ষণ নিজের কথাই বলেছেন। এসেছিলেন কিছু জানা যায় কি না চেষ্টা করে দেখতে। ভদ্রলোকের অনর্গল কথার তোড়ে দিশেহারা হয়ে মনে হয়েছে ছাড়া পেলে বাঁচেন।

ভদ্রলোকের নাম বিশ্বম্ভর রায়। তাঁর সব কথাই শুনেছেন। কাউল সাহেবের আর সব পাওনাদারের মতো তিনিও কেমন করে ফাঁকি পড়তে বসেছিলেন, শুধু নেহাত বরাত জোরে কী করে কাউল সাহেবের অন্তর্ধানের আগে তার কাছ থেকে বাড়িটা নিজের নামে কিনে নিতে পেরেছেন, বাড়িটা পেয়েও এখনও কী গণ্ডগোল তাঁকে পোহাতে হচ্ছে, অন্য পাওনাদাররা সারাদিন কীভাবে এসে জ্বালাতন করছে, কেউ কেউ বাড়ি বিক্রি নাকচ করবার চেষ্টাও নাকি করছে—এইসব কাহিনীই তিনি বলে গেছেন।

কাউল সাহেবের উধাও হওয়া যত অদ্ভুতই হোক, দু-চার দিন বাদে আপনারাও ব্যাপারটা প্রায় ভুলতে বসেছিলেন। এমন সময় আপনাদের পাড়ারই যে মিউনিসিপ্যাল পুকুরটায় ছেলেরা সাঁতার শেখে, তার তলা থেকে একটা ছড়ি একটি ছেলে ডুব দিতে গিয়ে তুলে এনেছে। সে ছড়িটা এমন কিছু আশ্চর্য জিনিস নয়, তবু আপনাদের দু-একজনের মনে হয়েছে, ঠিক এইরকম ছড়িই যেন কাউল সাহেবের হাতে আপনারা দেখেছেন। ব্যাপারটা এত সামান্য যে এ নিয়ে পুলিশে যাওয়া যায় না, অথচ মনের সন্দেহ দূর হয় না।

ক-জনে মিলে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রহস্যটা যেন গভীর হয়ে উঠেছে। আপনাদের মনে পড়েছে যে বিশ্বম্ভরবাবু কখন কবে যে তালা খুলে ওবাড়িতে ঢুকেছেন আপনারা কেউই দেখেননি! সেটাও না হয় অগ্রাহ্য করা গেল, কিন্তু বিশ্বম্ভরবাবুর চালচলনও কেমন অদ্ভুত মনে হয়েছে এবার। সেই প্রথম ক-দিন সকলের সঙ্গে মেলামেশার পর তিনি যেন ডুব মেরেছেন একেবারে। মিস্ত্রি-মজুর বাড়িতে আর খাটছে না। তালা দেওয়া না হলেও দরজা বন্ধই থাকে বেশির ভাগ। রাত্রে মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক ছাড়া বাড়ি আগেকার মতোই যেন নিস্তব্ধ।

এর মধ্যে পাড়ার একটি রাস্তায় এক রাত্রে কেউ কাউল সাহেবের সেই কুকুরটাকে একটি ছেলে ন-টার শো-র বায়স্কোপ ভাঙবার পর বাড়ি ফেরবার পথে দেখতে পায়। বিশ্বম্ভরবাবুকেও নাকি গভীর রাত্রে কেউ কেউ ব্যস্তসমস্ত হয়ে নির্জন রাস্তায় হাঁটতে দেখেছে। তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে কিন্তু ফল হয়নি কিছু। তিনি যেন বুঝতে পেরে এদিক-ওদিক ঘুরে বাড়িতেই ফিরে এসেছেন।

সমস্ত ব্যাপার জড়িয়ে আপনাদের মনে একটা দারুণ সন্দেহ জট পাকিয়ে উঠেছে। কাউল সাহেব সত্যিই দেনার দায়ে পালিয়েছেন, না তাঁর অন্তর্ধান হওয়ার ব্যাপারে অন্য কোনও রহস্য আছে। কাউল সাহেবের সঙ্গে বিশ্বম্ভরবাবুর সম্পর্কটা কী ও কতটা তা নিয়েও আপনাদের মনে সন্দেহ জেগেছে। শুধু নিজেদের মনের এই সন্দেহ নিয়ে পুলিশের কাছে যাওয়া এখুনি সংগত

হবে কি না ঠিক করতে না পেরে আমার কাছে এসেছেন কেমন?'

উত্তর দেবার আগে বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে পরাশর বর্মার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বললাম, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। সমস্ত ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।'

'সাংঘাতিক কিছু এর ভেতর থাকতে পারে মনে হচ্ছে, তাই না?'

বাধ্য হয়ে স্বীকার করলাম যে আমাদের আশঙ্কা সেইরকম।

পরাশর গম্ভীর হয়ে খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'যেমন কাউল সাহেব পালিয়ে যাননি, তাঁকেই কেউ হয়তো সরিয়ে ফেলেছে, পুকুরের ভেতর থেকে ছড়িটা পেয়ে এইরকম অনুমানই হয়।'

উৎসাহিত হয়ে উঠে বললাম, 'আমরা ঠিক তা-ই ভেবেছি। শুধু ছড়িটা পাওয়া গেলেও লাশটা কেন পাওয়া যায়নি তাই বুঝতে পারছি না।'

'লাশটা তো বাড়ির ভেতরেই থাকতে পারে।' পরাশরের গলা অত্যন্ত গম্ভীর।

অবাক হয়ে বললাম, 'বাড়ির ভেতর? তা হলে?'

'তা হলে লাশ আর খুনে দুই-ই যাতে ধরা পড়ে তার ব্যবস্থা এখুনি করা দরকার,' বলে পরাশর পাশের ফোনটা তুলে নিলেন।

'ও কী, ফোন করছেন কোথায়?' সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম।

ততক্ষণে ফোনের নম্বর ঘোরানো হয়ে গেছে।

'হ্যালো!' বলে পরাশর যাঁর নাম করলেন তিনি যে পুলিশের গোয়েন্দাবিভাগের মস্তবড় কর্মচারী তা জানি বলে আমি আরও অবাক।

বিমূঢ়ভাবে পরাশরের ফোনের আলাপ শুনতে লাগলাম।

'হ্যাঁ, আমি পরাশর। না, না, গদাধর নয়, পরাশর—হ্যাঁ, পরাশর বর্মা, কবি পরাশর বর্মা। না না, কবিতা শোনাতে ডাকছি না, ডাকছি তোমাদেরই একটু উপকার করতে। নিতাই মুস্তোফি স্ট্রিটের এস কাউল সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল আছে কি? আছে। বেশ! তার অন্তর্ধান রহস্যের কিনারা করতে চাও? কাউল সাহেবকে কেউ সরিয়েছে সন্দেহ করছ? ভাল, ভাল! আমাদের কৃত্তিবাসবাবুরও তাই মত। কৃত্তিবাসবাবু কে? চিনবে না ঠিক। সাহিত্যের খবর তো রাখো না, তিনি মস্তবড় এক কাগজের সম্পাদক। কবিতা শুনতে এসেছেন আমার বাড়িতে। যাক, এখন ওসব কথার সময় নেই। কাউল সাহেবের লাশ পাচ্ছ না! পাবে। লাশ আর খুনি একসঙ্গেই। এখুনি চলে যাও মুস্তোফি স্ট্রিটে। বিশ্বম্ভরবাবুকে এখনও পেতে পারো। ওয়ারেন্ট নিয়ে যাও সঙ্গে। একেবারে দেখামাত্র গ্রেফতার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, গ্রেফতার। প্রমাণ? প্রমাণ তিনি নিজেই। তাঁর অনেক কীর্তি ঘাঁটলে বেরোবে। হ্যাঁ, তিনিই লাশ, তিনিই খুনি!'

ওধারে গোয়েন্দাবিভাগের উচ্চ কর্মচারী, আর এধারে আমাকে সমানভাবে বিমূঢ় করে পরাশর বর্মা ফোনটা তৎক্ষণাৎ নামিয়ে রেখে দিলেন। বিস্ময়ের ধাক্কাটা একটু সামলে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি হঠাৎ খেপে গেলেন নাকি! না, আপনাদের মধ্যে এরকম ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলে!'

'ঠাট্টা-ইয়ার্কি!' পরাশর হাসলেন। 'পুলিশের লোকের সঙ্গে এমনি যত বন্ধুত্বই থাক, আসল ব্যাপারে ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলে না।'

'তার মানে? বিশ্বম্ভরবাবুই কাউলের লাশ আর খুনে—একথার মানে কী?'

'মানে যা বলেছি তা-ই। কাউল বলে কেউ নেই। বিশ্বম্ভর রায়ই কাউল সেজে দুনিয়াসুদ্ধ সকলকে ঠকিয়েছেন, এখন বিশ্বম্ভর হয়ে জাল গুটিয়ে আবার অন্য মৃগয়ায় যাবার তালে আছেন। তখন বাংলা বলতেন না, সাদা দাড়ি গোঁফ দিয়ে সৌম্য বিদেশি সেজে থাকতেন, এখন আবার বাংলা চেহারাটা বের করেছেন। সকলকে ফাঁকি দেবেন বলেই যেখানে যা পেরেছেন হাতিয়ে নিয়ে বাড়িটি নিজেকেই অন্য নামে বিক্রি করে গেছেন।'

'কিন্তু চোখে কিছু না দেখে শুধু আমার কাছে গল্প শুনে আপনি এ রহস্য বুঝলেন কী করে?'

'বুঝলাম কুকুরের ডাকে!'

'কুকুরের ডাকে?'

'হ্যাঁ, কুকুরের ডাকে! যুধিষ্ঠিরের বেলায় যম কুকুর সেজেছিলেন, আর বিশ্বম্ভরবাবুর বেলায় কুকুরই যম হল। কাউল সাহেব উধাও হবার পরও আপনারা বাড়িতে কুকুরের ডাক শুনেছেন। আপনিই বলেছেন, কুকুরটা হিংস্র। হিংস্র কুকুর হলে মনিব ছাড়া আর কারও সঙ্গে এক বাড়িতে কিছুতেই থাকত না। সে যে বন্ধ থাকে কোনও ঘরে তা-ও নয়, কারণ একদিন তাকে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে একজন দেখেছে। সেদিন কোনওরকমে দরজা খোলা পেয়ে কুকুরটা বেরিয়েছিল, আর বিশ্বম্ভরবাবুও তাকে খুঁজতে নির্জন রাস্তায় রাত্রে বেরিয়ে ছিলেন। বিশ্বম্ভরবাবু সব ভোল পালটে ছিলেন, শুধু কুকুরটার প্রতি মায়ায় তাকে কোথাও পাঠিয়ে দিতে কি মেরে ফেলতে পারেননি। আশা করি এতক্ষণ পুলিশের গাড়ি রওনা হয়ে পড়েছে তাঁকে ধরতে।'

মুখ থেকে আপনা থেকে বেরিয়ে গেল, 'সত্যি, কী বলে আপনার প্রশংসা করব ভেবে পাচ্ছি না।'

পরাশর বর্মা সলজ্জ একটু হেসে বললেন, 'তা হলে কোন কবিতাগুলো নেবেন?'

সাংঘাতিক শিশি ও পরাশর বর্মা

খুঁটিয়ে দেখলে হয়তো অনেক খুঁতই চোখে পড়বে। কিন্তু তার সময় বোধহয় মিলবে না। তার আগেই চমক লাগা চোখের সুপারিশে মন বিনা বিচারেই রায় দিয়ে বসে থাকবে।

দোলা দেবার মতো মেয়ে। একবার দেখলে লুকিয়ে আর একবার দেখতে ইচ্ছে করে। চেহারা পোশাক গড়ন চলন সবকিছুতে চোখ ধাঁধানো কিছু না থাকলেও এমন একটা বিরল কিছু আছে যার জন্য আধঘণ্টা ধরে ভ্যাপসা গরমে পঞ্চাশজন সমব্যথীর সঙ্গে কিউ দিয়ে হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকাটাও একটা খুব বড় শাস্তি মনে হয় না।

কিন্তু কিউয়ে দাঁড়িয়ে একটা উপস্থিতির উত্তাপ অনুভব করা এক কথা, আর বাস-এ উঠে সিট-এ বসে হঠাৎ চোখ টিপে ইশারা করা যে সাংঘাতিক ব্যাপার!

পরাশর তাই করল, আমাকে একেবারে স্তম্ভিত করে।

মেয়েটি আমাদের দু-মানুষ আগে উঠে আমাদের সামনের সিট-এ বসতে গিয়ে স্বাভাবিক কৌতূহলেই বোধহয় আমাদের দিকে তাকিয়েছিল।

সেই মুহূর্তে পরাশরের সেই সর্বনাশা পাগলামি।

আমার বুকের রক্ত তো হিম।

মেয়েটি ফিরে দাঁড়িয়ে এখুনি ওই মসৃণ সুগোল হাতের একটি চড় যদি না লাগায় তো অন্তত চিৎকার করে কিছু বললেই তো গেছি!

এই বিদেশ বিভুঁয়ে অপরিচিতদের মধ্যে কেলেঙ্কারির তো আর কিছু বাকি থাকবে না!

এক মুহূর্তের ব্যাপার। কিন্তু আমার মন সেই মুহূর্তে যাত্রীদের কাছে অপমান লাঞ্ছনা থেকে একেবারে থানা হাজত পর্যন্ত সবকিছু কল্পনা করে ফেলে।

পূর্বজন্মের কী পুণ্যফলে জানি না, সে যাত্রা কিন্তু বেঁচে যাই।

মেয়েটি একটু ভ্রুকুটি করে মুখ ফিরিয়ে বসে পড়ে তার সিট-এ।

আমার ধড়ে প্রাণ আসে এবং সেই সঙ্গে সংকল্প করি পরাশরের সঙ্গ এই বাস থেকে নেমেই বিষবৎ পরিত্যাগ করব।

ঘটনাস্থল বোম্বে। এবং সেখানে কী কুক্ষণে যে পরাশরের সঙ্গে অমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়েছে তাই ভাবি।

সম্পাদকদের এক সম্মিলনে আমেদাবাদ গেছলাম, সেখান থেকে ফেরবার পথে বোম্বেতে দু-দিনের জন্যে নেমেছিলাম একটু দেখে শুনে যাবার জন্যে।

পরাশর বর্মার সঙ্গে আচম্বিতে দেখা হবার পর থেকে সব দেখাশোনা মাথায় উঠেছে। এখন কোনওরকমে তার হাত থেকে ছাড়া পেলে বাঁচি।

না, এবারে কবিতা নয়, মনে হচ্ছে তার চেয়ে অনেক মারাত্মক ব্যাপার।

প্রেম!

প্রেম ছাড়া আর কীসে পরাশরের মতো বিচক্ষণ বুদ্ধিমান মানুষের কাণ্ডজ্ঞান ঘুচিয়ে দিয়ে তাকে এই সুদূর প্রবাসের শহরের যেখানে সেখানে নাকে দড়ি দিয়ে আহাম্মকের মতো অনর্থক ঘুরিয়ে মারতে পারে!

তা, পরাশর ঘুরতে চায় ঘুরুক, তার সঙ্গে অমন আশ্চর্যভাবে দেখা না হয়ে গেলে আমায় তো আর এ শাস্তি ভোগ করতে হয় না!

অথচ পরাশরকে প্রথম দেখে কী খুশি-ই না হয়েছিলাম!

এদিক ওদিক ঘুরে সেদিন ব্যাক বে-র ক্যাজওয়ে-র ওপর একটু বেড়াচ্ছিলাম বিকালবেলায়।

অপরূপ জায়গা। দু-দিকে সমুদ্রের নীল জল আর মাঝখান দিয়ে পায়ে চলার পাথর বাঁধানো রাস্তা সমুদ্রের মাঝখান পর্যন্ত চলে গেছে।

বোম্বের এ অঞ্চলের অনেকেই এখানে সান্ধ্যভ্রমণে আসে। সেদিন বাদলার হাওয়া একটু বেয়াড়া বলে ভিড়টা বুঝি একটু কম।

ক্যাজওয়ে-র দুধারে বড় বড় পাথরের চাঁই। সমুদ্রের তলা থেকে এইসব কালো পাথরের চাঁই ফেলেই নাতিপ্রশস্ত সেতু-পথটি তৈরি। পথের মাঝে মাঝে সেইসব পাথরের চাঁইয়ের ওপর অনেকে মাছ ধরতে বসে আছে।

সেই অদ্ভুত ধরনের মাছ ধরা লক্ষ করবার জন্যই এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম।

মাছ ধরার জন্য ছিপটিপ কিছু নেই। শুধু একটা লম্বা সুতোর এক প্রান্তে বঁড়শির সঙ্গে মোটা গোছের কীসের ভারী টোপ লাগিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সেটা যতদূর সম্ভব দূরে ছুড়ে ফেলে সুতো ধরে বসে থাকা। ধৈর্য অসীম চাই কিন্তু। কারণ কালেভদ্রেও মাছ ওঠে কি না সন্দেহ। তবে উঠলে একেবারে নাকি মোক্ষম। দশ-বিশ সেরের কম নয়।

আমার মতো আরও যে দু-চারজন কৌতূহলী দর্শক কাছে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের একজনের সঙ্গেই মাছ ধরা নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। আলাপ হচ্ছিল অবশ্য ইংরাজিতে। হঠাৎ তার মাঝে পরিষ্কার বাংলায় শুনলাম, 'মাছ না উঠলেই বা ক্ষতি কী? মাছ ধরার ছুতোয় সমুদ্রের হাওয়া তো খাওয়া যায়।'

অবাক হয়ে সামনের দিকে এবার নেমে গেলাম। মাছ যিনি ধরছিলেন মাথায় মারাঠি টুপির জন্যই পেছন থেকে তাঁকে বাঙালি বলে চিনতে পারিনি।

কাছে গিয়ে দেখি শুধু বাঙালি নয়, স্বয়ং পরাশর বর্মাই সুতো হাতে বসে আছেন।

পরাশর আমার দিকে ফিরে মুখ টিপে একটু হেসে বললে, 'সম্পাদক-সম্মিলনী বেশ ভালই জমেছিল তা হলে!'

যে প্রশ্নটা করতে যাচ্ছিলাম সেটা স্থগিত রেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতে হল, 'তুমি কী করে জানলে?'

'বাঃ—কবিতা লিখি বলে খবরের কাগজটাও কি পড়ি না?'

কবিতার কথাটা পাছে আবার ওঠে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে আসল প্রশ্নটা করলাম, 'কিন্তু তুমি এখানে কী করছ?'

'মাছ ধরছি!'

'আহা, তা তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু হঠাৎ বোম্বেতে এসেছ কেন?'

পরাশর হেসে বললে, 'মাছ ধরতে।'

'মাছ ধরতে সেই বাংলা দেশ থেকে এই বোম্বেতে এসেছ?'

'তা শখের জন্য মানুষ কী না করে? এ এক নতুন ধরনের মাছ ধরা তো!'

হেসে বললাম, 'ধরাটা কোথায়? এখনও একটাও ধরতে পেরেছ?'

'তা পারিনি। কিন্তু এ তো আর পুঁটি মাছ ধরা নয়, ছিপ ফেলো আর তোলো। দস্তুরমতো ধৈর্য দরকার, আমি তো মাত্র তিন দিন বসে আছি।' কিছু দূরের আর এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে পরাশর বললে, 'উনি আজ সাতদিন ধরে তপস্যা করছেন তা জানো?'

কিছু দূরে জলের একেবারে প্রান্তে একটি বড় পাথরের চাঁইয়ের ওপর যে ভদ্রলোক মাছ ধরতে বসে আছেন তাঁর দিকে এবার চেয়ে দেখলাম। শার্ট প্যান্ট পরা সাধারণ চেহারা, কোন প্রদেশের লোক বোঝবার উপায় নেই।

ধৈর্য যত অটলই হোক, একেবারে চুপ করে সুতো ধরে বসে থাকা বোধহয় যায় না। তিনি তখন সুতোটা গুটিয়ে নিয়ে টোপটা পরীক্ষা করে দেখছেন। তাঁর ভাবগতিক দেখে বোঝা গেল মাছেরা তাঁর টোপ একটু ঠোকরাতেও কেউ আসেনি। মাছেদের প্রলুব্ধ করবার জন্যই টোপের ওপর একটা শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা কী মাছেদের মুখরোচক চাটনিই বোধহয় তিনি ঢেলে সুতো ঘুরিয়ে দূরে ছুড়ে দিলেন।

পরাশরের ধৈর্য কিন্তু অনেক বেশি ঠুনকো। হাতের সুতোটা একটা পাথরের উঁচু হয়ে ওঠা কোণে বেঁধে রেখে সে বললে, 'চলো হে, পাড়াপড়শির সঙ্গে একটু আলাপ করে আসা যাক। মাছ ধরার নতুন প্যাঁচট্যাঁচ কিছু শেখাও যেতে পারে।'

মাছ ধরা যাদের ধ্যান-জ্ঞান তাদের মধ্যে যে প্রীতির অভাব নেই পাশের ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তা বোঝা গেল। ভদ্রলোক করুণ একটু হেসে আপ্যায়িত করে ইংরাজিতে বললেন, 'আপনারও কিছু হচ্ছে না বুঝি?'

পরাশর হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'নাঃ, আমার তো সন্দেহ হচ্ছে বোম্বাইয়ের সমুদ্রে মাছই আছে কি না।'

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। বললেন, 'দাঁড়ান দাঁড়ান, সবে তো এই তিনদিন এসে বসেছেন। বোম্বাইয়ের সমুদ্রের মাছকে অনেক সাধ্যসাধনা করতে হয়।'

'কিন্তু তাতেও কিছু লাভ হয় কি? আপনি তো শুনলাম এখানকার পাথর কামড়ে সাতদিন ধরে পড়ে আছেন।'

কথা বলতে বলতে পরাশর যা করল তাতে আমি একেবারে স্তম্ভিত।

ভদ্রলোকের চারের শিশিটা পাশে একটি পাথরের খাঁজে রাখা ছিল। স্পষ্ট দেখলাম কথা বলবার ফাঁকে পরাশর সেই শিশিটি হঠাৎ নিঃশব্দে তুলে নিয়ে বেমালুম পকেটে পুরে ফেলল।

এরপর দু একটা আজেবাজে কথা বলে পরাশর আমায় নিয়ে ওপরের রাস্তায় উঠে এসে হনহন করে পা চালালে।

আমি তখনও পরাশরের কাণ্ড দেখে থ হয়ে আছি।

পরাশরের সঙ্গলাভের শাস্তি আমার সেই থেকেই শুরু।

তার হাতে একবার পড়বার পর আর ছাড়ান-ছিড়েন নেই। যে হোটেলে উঠেছিলাম সেখান থেকে উঠিয়ে নিজের আস্তানায় এনে তো তুললই, দু-দিন বাদে কলকাতা ফেরার টিকিটটাও ফেরত দিয়ে টাকা আদায় করে যাওয়া বন্ধ করলে।

তারপর সারা দিন-রাত বোম্বাই শহর টো টো করে ঘুরে বেড়ানো। সে ঘুরে বেড়ানোর মূলে যে প্রেমঘটিত ব্যাপার থাকতে পারে তাও কি প্রথমটা বুঝেছি!

বুঝলাম, ক-দিন পরে, ঘুরে ফিরে একটি মেয়ের সঙ্গেই নানা জায়গায় দেখা হওয়ায়। সেদিন মেয়েটি বাস-এর লোককে ডেকে আমাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না করলেও বাস থেকে নামবার আগে বেশ একটু শিক্ষা দিয়ে গেল।

কয়েক স্টপ বাদেই মেয়েটি নামবার জন্যে উঠে পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমাদের দিকে না চেয়েই অনুচ্চ হলেও বেশ স্পষ্ট গলায় বলে গেল, 'চোখ খারাপ হলে দাওয়াই দিলেই হয়। দাদর বাজারে পানের দোকানেই পাবে।'

কথাটা এমন কিছু কটু হয়তো নয়, কিন্তু কথার জ্বালা তার বলার ভঙ্গিতে। মানে হোক না হোক, গলার স্বরে যেন বিছুটির বিষ!

তাতে কি পরাশরের লজ্জা আছে!

শুধু লজ্জা শরমের মাথাই সে খায়নি, নিজের মাথাটিও তার বেশ খারাপ হয়েছে বুঝলাম—যখন মেয়েটি নেমে যাবার কিছুক্ষণ পরে আর এক স্টপে নেমে সে আমায় সত্যি-সত্যিই দাদর বাজারে টেনে নিয়ে চলল নাছোড়বান্দা হয়ে।

'তুমি কি পাগল হলে নাকি পরাশর!' আমি প্রবল আপত্তি জানালাম বটে, কিন্তু বৃথাই।

পরাশর হেসে বললে, 'বাঃ! চোখের দাওয়াই খুঁজতে হবে না? এরপর দেখা হলে নইলে জবাব দেব কী?'

pathagar.net

এরপর যা হল তাতে হাসব না কাঁদব ভেবে পাই না।

দাদর বাজারে পানের দোকান তো একটা নয়। পর পর একটা করে পানের দোকানে গিয়ে দাঁড়ায় আর জিজ্ঞাসা করে, 'চোখের ওষুধ আছে?'

দোকানদারেরাও বেকুব। কেউ হাসে, কেউ বা কড়া করে শুনিয়ে দেয়—'এটা দাওয়াইখানা নয়।'

শেষে এক দোকানি পরাশরের মাথার অবস্থাটা বোধহয় অনুমান করে একটু মুচকি হেসে বললে, 'আছে বই কী শেঠজি।'

বলে রাখা উচিত, বোম্বাইয়ের লোকের কাছে সবাই শেঠজি।

সাপ ব্যাং যা হোক কিছু একটা, কিংবা হয়তো খানিকটা পানের মশলাই একটা কাগজে মুড়ে পরাশরের হাতে দিয়ে দোকানি বললে, 'খুব আচ্ছা দাওয়াই শেঠজি, চোখে দিলে সবকিছু একদম সাফ দেখা যাবে। দাম এক রুপেয়া।'

পরাশর নগদ একটি টাকা দিয়ে সত্যি-সত্যিই নিলে সেই পুরিয়া!

এরপর পরাশরকে পরিহার করলে দোষ হয়তো কিছু হত না। কিন্তু হাজার হোক বন্ধু লোক। তাকে এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছেড়ে বা যাই কী করে?

এ কাহিনী যাঁরা পড়ছেন তাঁরা নিশ্চয় বুঝেছেন, প্রথম আলাপের পর বন্ধুত্ব আমাদের এতদিনে বেশ প্রগাঢ় হয়ে এসেছে। 'আপনি' নেমে এসেছে 'তুমি'র অন্তরঙ্গতায়।

পরাশরকে তাই ছেড়ে যেতে পারলাম না। কিন্তু তার এ রোগ সারাবার জন্যে কী না করলাম ক-দিন! গোয়েন্দাগিরি তার শখ। হয়তো রহস্য রোমাঞ্চের খবর পেলে মনটা তার অন্য দিকে ফিরতে পারে ভেবে বেছে বেছে খবরের কাগজ থেকে রোজ গরম গরম রহস্যজনক, ও যাকে

বলে চাঞ্চল্যকর, যা কিছু খবর পেলাম তাকে শোনাতে ত্রুটি করলাম না।

কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। বোম্বাইয়ে বিরাটগড়ের বিধবা রানির অমন যে অমূল্য হিরা লোপাট হবার রহস্যে সারা শহর তোলপাড় তা শুনেও তার কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই।

'হারিয়েছে না কি হিরে একটা? ও হিরেটিরে থাকলেই হারায়!' বললে সে উদাসীনভাবে।

'আরে এমনই হিরে-টিরে নয়, এমন একটি হিরে, সারা দুনিয়ায় যার জোড়া খুব কম আছে।'

'তাতেই বা হয়েছে কী! রানি তো বিধবা, হিরে নিয়ে করবে কী? ও থাকলেও যা গেলেও তা-ই।'

'গেলেও তা-ই!' বেশ একটু রেগেই বললাম, 'বিরাটগড়ের অবস্থা এখন কাহিল। আগের রাজা যা পেয়েছেন উড়িয়ে পুড়িয়ে গিয়েছেন। এখন যিনি দেওয়ান তিনি কাজের লোক হয়েও সব দিক সামলাতে হিমসিম খাচ্ছেন। তার ওপর দিনকালও বদলেছে। প্রজাদের ওপর জুলুম করে তো আর কিছু আদায় হয় না। এখন অন্য রাস্তা বার করতে হয় আয় বাড়াবার। বিরাটগড়ে মস্ত একটা কয়লার খনির সন্ধান মিলেছে, কিন্তু তা চালু করতে তো টাকা চাই। রানি তাই দেওয়ানকে নিয়ে বোম্বাইয়ের জহুরিদের কাছে এই হিরে, অন্য দামি গয়না আর পাথরটাথরের সঙ্গে বিক্রি করতে আসছিলেন। সবকিছুর মধ্যে হিরেটাই খোয়া গেছে।'

এত যে বকে মরলাম পরাশর তাতে একটু কান দিয়েছে কি না তাই সন্দেহ। একমনে সে তখন খবরের কাগজের ফিল্মের পাতাটাই দেখছে। হঠাৎ আমার দিকে পাতাটা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'দেখো তো হে, তার ছবিই মনে হচ্ছে না?'

সিনেমার পাতা ভরতিই তো নানান ছবিতে। কার ছবির কথা পরাশর বলতে চাইছে বুঝলেও তার কোনও চিহ্নই সেখানে দেখতে পেলাম না।

একটু বিদ্রুপের সঙ্গেই তাই বললাম, 'এ সবই তো বড় বড় নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রীর ছবি। তোমার তিনি যদি মেক-আপে এতখানি বদলে গিয়ে থাকেন তা হলে অবশ্য আলাদা কথা।'

'না হে না, ওই বড় ছবিগুলোর কথা বলছি না। এই যে গ্রুপ ছবিটার পেছনের ওই মেয়েটিকে লক্ষ করে দেখো। সে-ই বলে মনে হচ্ছে না?'

খবরের কাগজের ধ্যাবড়া করে ছাপা দশ-বারোটি মেয়ে পুরুষের একটা পার্টির ছবি। বললাম, 'হতে পারে। কিন্তু তোমার মতো দিব্যদৃষ্টি না থাকলে ওই ছবি থেকে কাউকে আলাদা করে চেনা তো সম্ভব নয়।'

'কেন সম্ভব হবে না! তুমি যে ভালো করে মেয়েটিকে লক্ষই করোনি।' পরাশর বেশ ক্ষুণ্ণ।

বললাম, 'তা তোমার মতো ধ্যানজ্ঞান করিনি, তা সত্যি। এখন ছবিটা রেখে এই হারানো হিরের বৃত্তান্ত একটু শুনবে?'

'হ্যাঁ! হ্যাঁ! বলো না। শুনব না কেন?' শোনার আগ্রহ যে পরাশরের কত তা তার কথার ধরনেই বোঝা গেল।

তবু তার মনটাকে যদি একটু ফেরাতে পারি সে চেষ্টা করতে ছাড়লাম না—'কী করে যে কখন হিরেটা খোয়া গেছে তা-ই এক দুর্ভেদ্য রহস্য। এয়ার কন্ডিশন্ড কোচ-এ মাঝখানে দরজাওয়ালা পাশাপাশি দুটি কুপে-তে রানিসাহেবা দেওয়ান আর তাঁর ভাইকে নিয়ে বোম্বে এসেছেন। এক কামরায় একলা রানি আর পাশের কামরায় দেওয়ান আর তাঁর ভাই। দেওয়ানের কাছেই গয়নার তালা দেওয়া বাকস। এক মুহূর্তের জন্য তিনি সেটা অসাবধানে কোথাও ফেলে রাখেননি বলছেন। বাথরুমে যেতে হলেও রানির কাছে জিম্মা রেখে তবে গেছেন।

ট্রেনে তো কড়া পাহারা ছিলই, হিরেটা খুব বেশি টাকায় বিমা করা বলে, বিমা কোম্পানির ঝানু দু-জন গোয়েন্দা ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে নামার পরও ওঁদের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থেকেছে। রানিসাহেবার গয়নার বাকস নিয়ে গোলমাল কিছু একটা হতে পারে জানিয়ে বিমা

কোম্পানির বোম্বের হেড অফিসে একটা উড়ো চিঠি আসতে তাদের সাবধানতা একটু বেশি। যে নামকরা হোটেলে রানিসাহেবা গিয়ে উঠেছেন, সেখানকার ভল্টে হিরে জহরতের বাকস জমা দেবার পরও তারা পাহারায় ঢিল দেয়নি। হোটেলে লোক তো রেখেইছে, দেওয়ান আর রানিসাহেবার ভাই যশোবন্ত দেওকেও আলাদা আলাদা গোয়েন্দা দিয়ে চোখে চোখে রাখতে দ্বিধা করেনি। তাঁরা বিশেষ কোথাও যাননি, তবু যেখানে গেছেন, যা কিছু করেছেন সবকিছুর ওপর তারা লক্ষ রেখেছে। কিন্তু এত বজ্র আঁটুনি সত্ত্বেও কোথায় ফসকা গেরো ছিল কে জানে। পরের দিন নামকরা জহুরিদের একজন হোটেলে হিরে জহরতগুলো পরীক্ষা করতে এসেছেন। ভল্ট থেকে গয়নার বাকস বার করে তাঁর সামনে খোলার পর দেখা গেছে সবকিছুর মধ্যে আসল হিরেটাই নেই।

তখুনি পুলিশে খবর গেছে। পুলিশের লোক এসে কাউকে রেয়াত করেনি। সন্দেহটা দেওয়ান আর যশোবন্ত দেওয়ের ওপর পড়াই স্বাভাবিক। তাই রানির হোটেলের সুইট থেকে দেওয়ানের আর যশোবন্ত দেওয়ের কামরা সব তন্ন তন্ন করে তারা খুঁজেছে। কামরাগুলোতে খোঁজবার কারণ এই যে হিরেটা হোটেলের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও রাখা অসম্ভব। বোম্বাইয়ে সকালে এসে পৌঁছোবার পর একদিনের মধ্যে সামান্য একটু-আধটু রাস্তায়-ঘাটে বেড়ানো ছাড়া দু-জনের কেউই একটা দোকানে কি রেস্তোরাঁয় পর্যন্ত ঢোকেননি। আর রাস্তাঘাটে একটু যা বেরিয়েছেন তাতেও বিমা কোম্পানির গোয়েন্দাদের চোখের আড়াল হতে পারেননি কখনও।

সুতরাং হিরে যদি তাঁদের কেউ সরিয়ে থাকেন তা হলে হয় নিজের কাছে নয় নিজের কামরায় কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হিরে কোথাও পাওয়া যায়নি। দেওয়ান ও যশোবন্ত দেও স্বেচ্ছায় পুলিশকে নিজেদের পোশাক-আশাক খানাতল্লাশি করতে দিয়েছেন। রানির সুইট-এ যখন দু-জনেরই যাতায়াত আছে তখন পাছে রানির অজান্তে সেখানে হিরে কেউ লুকিয়ে রেখে থাকে সেই ভয়ে সে কামরাগুলিও খুঁজতে কিছু বাকি রাখা হয়নি। কিন্তু সব খোঁজাখুঁজিই বৃথা। হিরেটা যেন সত্যি হাওয়া হয়ে গেছে।

পুলিশের সন্দেহ দেওয়ানের ওপরই একটু বেশি। কারণ বাকসটা তাঁর কাছেই ছিল। কিন্তু রানিসাহেবা ও যশোবন্ত দেও দু-জনেই দেওয়ানের হয়ে সাফাই গেয়েছেন। যশোবন্ত দেও জানিয়েছেন যে ট্রেনে সারাক্ষণ তিনি দেওয়ানের সঙ্গে ছিলেন। বাকসটা কাছে রাখলেও খোলবার কোনও চেষ্টা যে তিনি করেননি যশোবন্ত তা হলফ করে বলতে পারেন। যশোবন্ত সম্বন্ধেও দেওয়ানের সেইরকম সাফাই। যশোবন্তকে কোনও সময়ে বাকসটা ছুঁতে পর্যন্ত দেওয়ান দেখেননি। দেওয়ান ও যশোবন্ত পরস্পরের এই সাফাই একটু অদ্ভুত। কারণ দু-জনের মধ্যে যে কোনও সদ্ভাব নেই পুলিশ তা জেনেছে। যশোবন্ত রানির আদরের ভাই। বোম্বেতে কিছুদিন থেকে ফিল্মের ব্যবসায় নেমেছে। দেওয়ান সে ব্যবসায় কোনওরকম সাহায্য দিতে বিরাটগড়ের স্বার্থের খাতিরেই নাকি নারাজ। আর যশোবন্তের মত হল স্বার্থটা বিরাটগড়ের নয়, দেওয়ানের নিজের। বিধবা রানিকে ভালমানুষ পেয়ে তিনি নাকি দু-হাতে চুরি করছেন।

তবু বিমা কোম্পানিকে ফাঁকি দেবার জন্যে রানিসাহেবা দেওয়ান আর যশোবন্ত মিলে ষড়যন্ত্র করেছেন এমন আজগুবি কল্পনাও যদি করা যায় তা হলেও ব্যাপারটার কোনও মানে হয় না, কারণ হিরেটা তা হলে গেল কোথায়? হিরেটা যেখানে হোক ফেলে দিয়ে শুধু বিমার টাকাটা আদায় করায় তো কোনও লাভ নেই কারও! বিমার পরিমাণ বেশি হলেও হিরের দামের চেয়ে কম। সুতরাং হিরেটা যদি কেউ নিয়ে থাকে তা হলে লুকিয়ে পরে বেচবার উদ্দেশ্যেই নিয়েছে। কিন্তু লুকিয়ে রাখবার কোনও উপায়ই কারও ছিল বলে দেখা যাচ্ছে না।'

পরাশর আমার হাত থেকে খবরের কাগজের সিনেমার পাতাটা আবার টেনে নিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'রহস্যের এইখানেই শেষ নয়। হিরেটা যে সত্যিই

হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। পরশু রাত্রে একজন জহুরি সেটা স্বচক্ষে দেখেছে বলে পুলিশকে জানিয়েছে। নামজাদা না হলেও সে হিরে জহরতের বেশ বড় কারবারি। রাত্রে দোকান বন্ধ করে সে কাছেই তার ক্যাডেল রোডের বাড়ি পর্যন্ত রোজ হেঁটেই যায়। পরশু রাত্রে নিয়মমতো হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ একটি নির্জন জায়গায় মাথায় পাগড়ি-বাঁধা সাদা গোঁফ-দাড়ি সমেত একটি বুড়ো গোছের লোক তাকে দাঁড়াতে ইশারা করে। তারপর কাছে এসে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে, একটা অমূল্য চোরাই হিরে সে অর্ধেক দামে নিতে রাজি কি না? জহুরি ঘুঘু লোক। সে তাকে হেসে বলে, হিরে তো আর রাস্তাঘাটে ছড়াছড়ি যাচ্ছে না যে চোরাই বললেই অমূল্য হয়ে উঠবে।

বৃদ্ধ লোকটি তখন তাকে একটি রাস্তার আলোর নীচে টেনে নিয়ে গিয়ে হাতের মুঠো খুলে সত্যিই একটি আশ্চর্য হিরে দেখায়। জহুরি খবরের কাগজে বিরাটগড়ের হিরে চুরির কথা আর তার বর্ণনা পড়েছে। সে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেও মনের ভাব গোপন করে বলে, হিরেটা তার ভাল করে পরীক্ষা করা দরকার, সুতরাং বৃদ্ধ যদি তার বাড়িতে একবার আসেন তা হলে ভাল হয়।

বৃদ্ধ তাতে একটু হেসে জানায়, ও সব চালাকির চেষ্টা বৃথা। চোরাই হিরে কিনে যদি দাঁও মারতে চায় তা হলে জহুরিকে এমনই রাস্তাতেই কিনতে হবে। তাকে একটা রাত্রি ভাববার সময় দেওয়া হচ্ছে। পরের দিন সে তার দোকানে আবার ফোন পাবে, এবং কিনতে রাজি থাকলে কোথায় কত টাকা নিয়ে যেতে হবে তা ও জানতে পারবে।

জহুরি ভয়ে ভয়ে পুলিশকে সেই রাত্রেই সব কথা জানায়। পরের দিন অবশ্য কেউ তাকে ফোনও করেনি।

পুলিশ কিন্তু এ ব্যাপারের পর আরও তৎপর হয়ে উঠেছে। জহুরি পুলিশকে বৃদ্ধের চেহারার যা বর্ণনা দিয়েছে, মাথায় পাগড়িটা বাদে তা প্রায় দেওয়ানের সঙ্গে মিলে যায়। দেওয়ানের কামরা নতুন করে সন্ধান তো তারা করেছেই, যশোবন্ত দেওকেও রেহাই দেয়নি। কিন্তু ভোজবাজিতে হঠাৎ দেখা দিয়ে হিরেটা আবার তেমনই লোপাট হয়ে গেছে।'

এতক্ষণ আমার কথাগুলো অন্তত ধৈর্য ধরে শোনার জন্যও আশা হচ্ছিল পরাশরকে বুঝি একটু কৌতূহলী করতে পেরেছি। কিন্তু তার পরের কথাতেই ভুল ভাঙল।

এত কথার পর ক্লান্তভাবে হাই তুলে সে শুধু বললে, 'ভারী মজার ব্যাপার তো! তুমি এত সব কী করে জানলে?'

চটে উঠে বললাম, 'জানলাম এই খবরের কাগজেই। "গোয়েন্দাগল্প হার মানে" লেখাটার অমন তিন কলম টানা জ্বলজ্বলে শিরোনামটা তোমার চোখেই পড়ল না? পড়বে কী করে, শুধু সিনেমার পাতায় মুখ গুঁজে থাকলে!'

বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে পরাশর বললে, 'ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। আজ এখানকার একটা স্টুডিওতে শুটিং দেখতে যাব, বুঝেছ? একটা অনুমতি জোগাড় করেছি।'

এবার তার দিকে চেয়ে হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কী করা যায়!

শুটিং দেখতে যেতেই হল তার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত। গিয়ে দেখলাম যা অনুমান করেছিলাম, শুটিং দেখার অত আগ্রহের কারণ ঠিক তা-ই।

অর্থাৎ সেই মেয়েটিও সেখানে আছে।

প্রকাণ্ড ফ্লোরে বিরাট এক হল-ঘরের বোম্বাই মার্কা সেট পড়েছে। সাজ-সরঞ্জাম আসবাবপত্র দেখে বোঝা যায় একটা ভোজসভা গোছের দৃশ্য তোলা হবে। মেয়েটি সেই সাজা অতিথি অভ্যাগতদের একজন।

আমাদের মতো দর্শক আরও অনেকেই এসেছে। ভিড়ের মধ্যে কে দর্শক কে অভিনেতা বোঝা কঠিন এক মুখের রংচং ছাড়া। ভিড় বাড়াবার ফালতু অভিনেতাদের সকলের মুখে আবার রং দেবারও দরকার হয়নি।

শুটিং দেখা একেই বিরক্তিকর ব্যাপার, তার ওপর পরাশরের বেয়াড়া দুঃসাহসে আর বেহায়াপনায় ওখানে থাকা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল।

ক্যামেরাম্যান সেট-এর আলো সাজাতে ব্যস্ত। মেয়েটি এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে মাঝে মাঝে। পরাশরও নির্লজ্জের মতো চেষ্টা করছে তার কাছাকাছি থাকবার।

যা ভয় করছিলাম তাই হল। মেয়েটি হঠাৎ একবার ফিরে দাঁড়াল ভ্রুকুটি করে।

'আপনি—আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে!'

মনে মনে আমি দুর্গানাম জপ করতে শুরু করেছি তখন, কিন্তু পরাশর অম্লান বদনে একমুখ হেসে বললে, 'তা দেখা আর আশ্চর্য কী! বোম্বাই আর এমন কী বড় শহর!'

'বড় না হতে পারে, কিন্তু বোম্বাই বড় বেয়াড়া শহর তা ভুলে যাবেন না।'

অবজ্ঞাভরে আমাদের দিকে চেয়ে ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে মুখে পাউডারের প্যাডটা বুলোতে বুলোতে মেয়েটি আবার বললে, 'এখানে ওষুধে যাদের চোখ খারাপ সারে না, কানার মতো তারা গাড়ি চাপাও পড়ে।'

কথাটা বলেই মেয়েটি চলে যাচ্ছিল, কিন্তু পরাশর এবার পাগলামির চূড়ান্ত করে বসল।

'শুনছেন, দেবী,' বলে পেছন থেকে ডেকে হঠাৎ পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে বললে, 'আপনার ব্যাগ থেকে এটা পড়ে গেছল, দেখতে পাননি বোধহয়।'

মেয়েটির অবাক হবার পর্যন্ত কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। নোটটা পরাশরের হাত থেকে নির্বিকারভাবে নিয়ে সে ব্যাগের মধ্যে রেখে চলে গেল।

'এটা কী হল পরাশর!' রাগে আগুন হয়ে আরও কিছু তাকে বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বলা আর হল না।

ইতিমধ্যেই মেয়েটি ফিরে এসে নোটটা ঘৃণাভরে ডেলা পাকিয়ে পরাশরের দিকে ছুড়ে দিয়ে গলায় যতদূর সম্ভব বিষ ঢেলে বললে, 'নোটটা আপনারই মনে হচ্ছে, কারণ এরকম ভাল নোট আমার ব্যাগে থাকে না।'

মেয়েটি চলে গেল। দু-একজন যারা কাছে ছিল তারা ব্যাপারটা ভাল না বুঝলেও হেসে উঠল।

এই চরম অপমানের পরও পরাশরকে হয়তো সেখান থেকে নড়ানো যেত না। কিন্তু হঠাৎ দূর থেকে এক ভদ্রলোককে হাসিমুখে আমাদের দিকে ভিড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

পরাশর সেই মুহূর্তেই আমাকে সবেগে টেনে নিয়ে একেবারে ফ্লোর থেকে স্টুডিও-র গেটের বাইরে ছুট!

গেটের বাইরে পৌঁছে অবাক হয়ে বললাম, 'কী হল কী হঠাৎ! ভূত দেখলে নাকি?'

'প্রায় তা-ই।'

পরাশরের জবাবটার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা আমার কাছে খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ভদ্রলোককে তখন আমি চিনতে পেরেছি। মনে পাপ থাকার দরুন পরাশর অবশ্য চিনেছে একবার দেখামাত্র।

হেসে বললাম, 'কিন্তু অত ভয় পাবার তো কিছু ছিল না। ভদ্রলোকের মনে কিছু থাকলে অমন হাসিমুখে আমাদের দিকে আসতেন?'

পরাশর এবার অন্তত আমার যুক্তিটা স্বীকার না করে পারল না। লজ্জিতভাবে বললে, 'তাও তো বটে!'

'যাক, ভদ্রলোক আমাদের উপকারই করেছেন। ওঁকে না দেখলে তো ওই স্টুডিও ছেড়ে আর আসতে না। কিন্তু ওই মেয়েটির পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে কোথায় এসেছিলে তা বোধহয় জানো না?'

পরাশর অবাক হয়ে বললে, 'কোথায় আবার? স্টুডিওতে শুটিং দেখতে।'

কিন্তু কীসের শুটিং তা তো জানো না। এ হচ্ছে ওই বিরাটগড়ের রানির ভাই যশোবন্ত দেওয়েরই ছবি। ছবির নামও আবার "আনমোল হিরা" অর্থাৎ অমূল্য হিরা। আমরা চিনি না, কিন্তু বুড়ো দেওয়ানও নাকি আজ ওখানে উপস্থিত আছে।'

'তাই নাকি! তুমি জানলে কী করে?'

'তুমি যখন মেয়েটির পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছ তখন একজনকে জিজ্ঞাসা করে সব জানলাম। বিরাটগড়ের রহস্যটা আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে যেন।'

পরাশর ওই উসকানিতেও কোনও সাড়াই দিলে না।

বই নং
তারিখ

এর পরের কয়েকটা ব্যাপার যা ঘটল তা আমার অন্তত কল্পনাতীত।

প্রথমত স্টুডিও থেকে ফেরার পথে সেই রাত্রে মেয়েটির অভিশাপ প্রায় ফলেই যাচ্ছিল।

বান্দ্রা স্টেশনে নেমে একটুখানি হেঁটে গেলেই ঘোড়বন্দর রোডের ওপর আমাদের বাসা। কোন এক বন্ধু কাজের খাতিরে বাইরে যাবার দরুন পরাশর বাসাটি খালি পেয়েছে ক-দিনের জন্যে। আমাকেও এনে সেখানে তুলেছে তাই।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে ঘোড়বন্দর রোডে পড়ে, রাস্তাটা পার হতে যাচ্ছি, এমন সময় পরাশরের হেঁচকা টানে একেবারে রাস্তার ধারের খানার মধ্যে প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ি আর কী! সেই মুহূর্তেই বিদ্যুৎ বেগে একটা গাড়ি একেবারে আমাদের গা ঘেঁষে যেভাবে বেরিয়ে গেল তাতে বুঝলাম পরাশরের টান দিতে এতটুকু দেরি হলে আমাদের আর চিহ্ন থাকত না।

খানা থেকে উঠে জামাকাপড়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললাম, 'গাড়িটার মজা দেখেছ? হর্ন তো দেয়ইনি, সামনে পেছনে একটা আলোও নেই!'

পরাশরের জবাবটা যেন একটু অদ্ভুত। বললে, 'আলো থাকলে কি রাস্তা ভুল হয়!'

অদ্ভুত পরাশরের পরের দিনের কাণ্ডকারখানা।

পরের দিন সকালে খবরের কাগজ খুলতেই বিরাটগড়ের খবরটা চোখে পড়ল। বড় বড় শিরোনামা দিয়ে খবরটা ছাপা হয়েছে—বিরাটগড়ের হীরক চুরির দায়ে দেওয়ান গ্রেপ্তার।

পরাশরকে খবরটা শোনাব ভাবছি, হঠাৎ ভেতরের ঘর থেকে একেবারে সেজেগুজে তৈরি হয়ে এসে সে বললে, 'চলো, বেরোতে হবে এখুনি।'

'সে কী, এই সকালে কোথায় যাব আবার?'

'প্রশ্ন কোরো না। যেতে যদি চাও তো গায়ে জামাটা শুধু চড়িয়ে চলে এসো।'

'কিন্তু'—আমি একটু বাধা দেবার চেষ্টা করলাম—'দেখেছ আজকের খবরটা?'

'দেখেছি।' গম্ভীরভাবে বললে পরাশর, 'আমরা বিরাটগড়ের রানির হোটেলেই যাচ্ছি।'

'বিরাটগড়ের রানিসাহেবার সঙ্গে দেখা করতে চাই!'

বোম্বের সবচেয়ে নামজাদা হোটেলের লবিতে ঝকঝকে তার কাউন্টারে বসে নিখুঁত পোশাক পরা হোটেলের ক্লার্ক অবজ্ঞাভরে একবার আমাদের চেহারা, পোশাকের ওপর চোখ বুলিয়ে তাচ্ছিল্যভরে জানালে, 'রানিসাহেবা কারও সঙ্গে বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্ট-এ দেখা করেন না।'

জবাবে পরাশর একটা কার্ড বার করে তাতে কী লিখে তার হাতে দিতেই কিন্তু যেন ভোজবাজি হয়ে গেল। হোটের ক্লার্ক শশব্যস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ ফোনে রানিসাহেবার সুইট-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানালে, রানিসাহেবার সেক্রেটারি ও সঙ্গিনী এখুনি নেমে এসে আমাদের নিয়ে যাবেন। কয়েক মিনিট বাদেই যিনি লিফটে নেমে এলেন তাঁকে দেখে আমি তো অবাক। আর কেউ নয়, সেই মেয়েটি।

N/DL DISTRICT LIBRARY SILIGURI
ACC No. 29137

মেয়েটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসার পর হোটেলের ক্লার্ক তার হাতে পরাশরের কার্ডটা দিয়ে বললে, 'এঁরাই দেখা করতে চান রানিসাহেবার সঙ্গে।'

মেয়েটির মুখে গোড়া থেকেই একটু যেন বিদ্রুপের হাসি। কার্ডটা পড়েও তার কোনও পরিবর্তন হল না।

শুধু 'আসুন' বলে লিফটের দিকে সে এগিয়ে গেল।

লিফটে উঠতে উঠতে সে একবার শুধু রহস্যময়ভাবে একটু হেসে বললে, 'চোখের দোষে গাড়ি চাপা তা হলে পড়েননি!'

পরাশর তেমনই হেসে জবাব দিলে, 'না, জাল নোট আমাদের বাঁচিয়েছে।'

তিনটে আলাদা কামরা নিয়ে তেতলায় রানিসাহেবার সুইট।

রানিসাহেবা আমাদের অপেক্ষায় আগে থাকতে তাঁর অভ্যর্থনা ঘরে বসে আছেন দেখলাম। একটি সুপুরুষ পাজামা পরা ভদ্রলোকও সেখানে দাঁড়িয়ে। চেহারা দেখেই রানিসাহেবার ভাই যশোবন্ত দেও বলে মনে হল। রানিসাহেবা আমাদের নমস্কারের উত্তরে প্রতি-নমস্কার করে একটু বিস্মিতভাবেই আমাদের লক্ষ করে বললেন, 'বসুন।'

পরাশর ও আমি বসলাম।

রানিসাহেবা একটু বিমূঢ় ভাবেই বললেন, 'আপনারা যা বলছেন শুনলাম, তা বিশ্বাস করা শক্ত। তবু আপনাদের কথা যদি সত্যি হয় তা হলে আমার কাছে না এসে পুলিশকে জানালেই তো পারতেন।'

'তা পারতাম। তবু মনে হল আপনাকে জানানোই আগে উচিত।'

ঘরের অপর ভদ্রলোক এবার রানিসাহেবার দিকে চেয়ে বললেন, 'তা হলে আমি এখন চলি, দিদি।'

'না যাবেন না, যশোবন্তজি। আপনিও না, মিস মলি। আপনাদেরও থাকা দরকার।'

মিস মলি কিছু না বলে ফিরে দাঁড়ালেন।

যশোবন্ত দেও একটু হেসে বললেন, 'আমার থেকে লাভ কী? তা ছাড়া আমার একটু কাজও আছে।'

'সেই কাজটাই আপনাকে করতে দিতে চাই না। অবশ্য করা সম্ভবও নয়।'

'তার মানে?' যশোবন্ত দেও বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলেন।

'মানে সবই বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে রানিসাহেবা, আপনি একটু পুলিশকে ফোন করুন।'

রানিসাহেবা অবাক হয়ে বললেন, 'পুলিশকে ফোন করব! কী জন্যে?'

'দেওয়ানজিকে ছেড়ে দেবার জন্যে।'

রানিসাহেবা এবার হেসে ফেললেন—'আমি বললেই পুলিশ ছেড়ে দেবে?'

'হ্যাঁ, দেবে। যদি আপনি বলেন, হারানো হিরেটা পাওয়া গেছে।'

রানিসাহেবার মুখে এবার স্পষ্ট বিরক্তি দেখা গেল। সেটা গলার স্বরেও গোপন না করে বললেন, 'এসব আজেবাজে কথায় নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই। মাফ করবেন।'

রানিসাহেবা সাক্ষাৎকার শেষ হয়েছে বুঝিয়ে ওঠবার উপক্রম করলেও পরাশর সমানভাবে বসে থেকে গম্ভীরভাবে বললে, 'এখুনি উঠবেন না। আজেবাজে কথা বলছি কি না আপনার ভাইকেই জিজ্ঞাসা করুন।'

'আমাকে!' যশোবন্ত এবার একটু রেগেই বললেন, 'আমি আপনার সাক্ষী নাকি?'

পরাশর হাসল—'সাক্ষী না হলে যে আসামি হতে হয়। তার চেয়ে হিরেটা পাওয়া গেছে বলাই ভাল নয়?'

'সে কথা আমি বলতে যাব কেন? হিরের আমি কী জানি!' যশোবন্ত এবার বিদ্রুপের হাসি

হেসেই বললেন, 'আমার কাছে হিরে থাকলে বিমা কোম্পানির গোয়েন্দা আর পুলিশের নজর এড়িয়ে থাকতে পারতাম? হিরে আমি রাখব কোথায়?'

'সেটা একটা সমস্যা বটে!' বলে হঠাৎ পকেট থেকে পরাশর যে সরু শিশিটা বার করল সেটা দেখেই আমি চিনলাম। মনে হল যশোবন্ত দেও-ও এক মুহূর্তের জন্য একটু যেন বিচলিত হলেন।

শিশিটা দু-আঙুলে তুলে ধরে পরাশর আবার বললে, 'দেখুন তো, এটা দেখে কিছু হদিস পান কি না?'

যশোবন্ত ভ্রুকুটি করে বললেন, 'ওটা আবার কী? পাগলামির আর জায়গা পাননি!'

আমারও মনের কথাটা তখন প্রায় তা-ই। কিন্তু পরাশর অবিচলিতভাবে হেসে বললে, 'পাগলামি মনে হচ্ছে, না?' তারপর হঠাৎ পকেট থেকে সে যা যা বার করল তাতে আমি একেবারে হতভম্ব। তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ না করে উপায় নেই।

তার পকেট থেকে বেরোল চোখের দাওয়াই বলে দাদর বাজারের সেই পানওয়ালার দেওয়া ক-টা পুরিয়া আর সেই পাকানো দোমড়ানো নোট-টা। পুরিয়াগুলো খুলতে খুলতে পরাশর হেসে বললে, 'আপনি বুদ্ধিমান লোক, যশোবন্তজি, কিন্তু ডালে ডালে ঘুরলেও পাতায় পাতায় কেউ থাকতে পারে এইটুকু শুধু ভাবতে পারেননি। আপনি কবে কোথায় গেছেন, কার সঙ্গে কখন দেখা করেছেন সব খবরই আমি রেখেছি। প্রথমদিন বিমা কোম্পানির গোয়েন্দা আপনার পেছনে লেগে থাকলেও দোষের কিছু দেখতে পায়নি। না পাওয়াই স্বাভাবিক। আপনি একটু একা একা হাওয়া খেয়ে বেড়িয়েছেন মাত্র। দোকানে রেস্তোরাঁতে পর্যন্ত ঢোকেননি, কোথাও দাঁড়িয়ে দু মিনিট কারও সঙ্গে কথা বললেও কারও হাতে কিছু চালান করেননি। কেউ তাই কিছুই সন্দেহ করেনি। এই শিশিই আপনার অস্ত্র, কিন্তু এই শিশিই হল আপনার কাল। শিশিটা চুরি যাওয়ার খবর পাওয়ার পরই আপনি সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন।'

'কী যা তা আপনি বকছেন!' যশোবন্ত দেও এবার বেশ ক্ষিপ্ত—'কোথায় আপনি এসেছেন তা ভুলে যাচ্ছেন। ভালয় ভালয় এখুনি বিদায় না হলে আমি পুলিশ ডাকব।'

'বেশ, তাই ডাকুন তা হলে, আমার পরিশ্রমটা বেঁচে যায়' বলে পরাশর হাসল।

যশোবন্তজির কিন্তু পুলিশ ডাকবার কোনও উৎসাহ দেখা গেল না আর।

রানিসাহেবাই এবার বললেন, 'আপনি কী বলতে চান কী? হিরেটা যে যশোবন্তের কাছে আছে তার প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ এই শিশি! কী, যশোবন্তজি, হিরেটা পাওয়া গেছে বলে পুলিশকে জানাবেন, না আমাকেই ফোন ধরতে হবে?'

'তোমার খেলা খতম, মিস্টার দেও। ভালয় ভালয় ছাড়া পাবার এ সুযোগ অবহেলা কোরো না।' মিস মলিই হেসে ইংরাজিতে বললে।

হিংস্রভাবে তার দিকে ফিরে যশোবন্তজি বললেন, 'তুমি! তুমি এসবের কী জানো?'

'সব জানে, যশোবন্তজি! ও আমাদেরই লোক। সুন্দরী মেয়ের ওপর আপনার স্বাভাবিক দুর্বলতা জেনে আমরাই কায়দা করে ওকে রানিসাহেবার সঙ্গিনী আর সেক্রেটারি করবার ব্যবস্থা করি। ওর কাছে সব খবর না পেলে কাল হয়তো আমাদের গাড়ি চাপা দেবার মতলব আপনার হাসিলই হত। কিন্তু সেটা না হয়ে ভালই হয়েছে, পুলিশের হাত থেকে আর রেহাই পেতেন না। সুতরাং ওকে ধন্যবাদই দিন।'

'ধন্যবাদ দেব! পাজি শয়তান মেয়ে! ওকে বিশ্বাস করে আমি ছবিতে বড় পার্ট পর্যন্ত দেব বলেছিলাম।'

'সেইটে ভুল করেছিলেন। সবাই ছবিতে অভিনয়ের জন্যে ব্যাকুল নয়। অভিনয়ের অনেক বড় ক্ষেত্রও আছে। মিস মলি এখানকার এক বড় ডিটেকটিভ এজেন্সিতে কাজ করে। আমি ওর

ক্ষমতার কথা জেনেই ওকে এ কাজে লাগাই। কিন্তু ওকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস তো আপনি করেননি। শিশিটা চুরি যাবার পর ওর ওপরও নজর রাখবার ব্যবস্থা করেই আমার পরিচয় জানতে পেরেছিলেন। সেইখানে আমার ত্রুটি আমি স্বীকার করছি। যথেষ্ট সাবধান হলেও আমার চালের নিশ্চয় কিছু ভুল ছিল।'

'কিন্তু আসল কথাটা আমি এখনও বুঝতে পারছি না,' রানিসাহেবা বললেন, 'হিরেটা কোথায়? তার সঙ্গে এই শিশিটার সম্পর্ক কী?'

'সম্পর্ক শিশিটা শুঁকে দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন।' পরাশর শিশিটাকে এগিয়ে দিলে।

সেটা শুঁকে মুখ একটু বিকৃত করে রানিসাহেবা বললেন, 'এ তো কেরোসিনের গন্ধ।'

'হ্যাঁ, কেরোসিন তেলই ওর মধ্যে ছিল। কেরোসিন তেল মাছেদের প্রিয় কখনও শুনেছেন?'

'না, মাছ তো কেরোসিনের গন্ধে টোপই খাবে না।'

'টোপ যাতে না খায় তা-ই ওই শিশির উদ্দেশ্য। প্রথম দিন বোম্বে পৌঁছে যশোবন্তজি এধার ওধার একটু বেড়িয়েছেন, ক্যাজওয়ে-তে গিয়ে যদি তিনি দু-দণ্ড কোথাও মাছ ধরা দেখে থাকেন তাতেও কোনও দোষ নেই। তাঁর আগে থাকতে পাতা ফন্দি অনুযায়ী তাঁর নিজের লোকই সেখানে মাছ ধরছে কে জানবে! সে লোকটির হাতে তিনি কিছু দেননি। একবার শুধু যেন শখ মেটাতে টোপ সমেত সুতোটা চেয়ে নিয়ে হাতের কসরতে টোপের মধ্যে হাতের মুঠোর হিরেটা আটকে দিয়ে ঘুরিয়ে সেটা সমুদ্রে ফেলে দিয়ে থাকেন তাতে সন্দেহ করবার কিছু নেই বলেই বিমা কোম্পানির গোয়েন্দারা সে ব্যাপারটার উল্লেখও করেনি। টোপটা ময়দা বা মাছের কোনও লোভনীয় খাদ্যের নয়। আগে থাকতেই প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে তৈরি। তবু সাবধানের মার নেই বলে পাছে মাছেরা খেতে চায় এই ভয়ে তার ওপর কেরোসিন তেল কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর একটু একটু করে ঢালা হয়েছে এবং ক্যাজওয়ে-তে গিয়ে একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন, এখনও এক জায়গায় হচ্ছে। ক্যাজওয়ে-তে যে লোকটি প্রায় দিবারাত্র মাছ ধরায় ব্যস্ত—সে যে যশোবন্তজিরই লোক এবং যশোবন্তজি যে মাঝে-মাঝে ইতিমধ্যে ক্যাজওয়ে-তে বেড়াতে গেছেন মিস মলির কাছেই সে খবর আমি এইসব চোখের দাওয়াইয়ের মোড়কের মধ্যে পেয়েছি। গভীর রাত্রে অবশ্য ক্যাজওয়ে-তে কেউ থাকে না। মাছ ধরা সুতোটা একটা পাথরে ভাল করে বেঁধে চলে এলে হিরেটা হারাবার ভয় কিন্তু কিছু নেই। ওরকম অনেকেই রাত্রে সুতোটা পাথরে বেঁধে চলে আসে, সুতরাং ব্যাপারটা অস্বাভাবিকও নয়। হিরেটা তাড়াতাড়ি বেচবার আশায় যশোবন্তজি এক রাত্রে ওটা টোপ থেকে খুলে নিয়ে কী করেছিলেন আমরা জানি। দেওয়ানের ওপর সন্দেহ ফেলবার জন্যেই অবশ্য বুড়োর চেহারায় তিনি সেজেছিলেন। কী ভাগ্যি সে জহুরি চোরাই মালটা নিতে রাজি হয়নি, নইলে আমাদের খাটুনি আরও বাড়ত, বিরাটগড়ের সুনামও বাঁচানো যেত না।'

একটু থেমে যশোবন্তর দিকে চেয়ে পরাশর বললে, 'কী যশোবন্তজি, হিরেটা রানিসাহেবাকে ফিরিয়ে দেবার কথা দিয়ে পুলিশকে সেটা পাওয়া গেছে বলে জানাবেন, না ব্যাপারটা প্রকাশ্য কেলেঙ্কারিতে গড়াতে দিয়ে বিরাটগড়ের নামে কালি মাখাবেন?'

যশোবন্তর বদলে রানিসাহেবাই কথা বললেন, 'আমি নিজেই পুলিশকে ফোন করছি। কিন্তু তার আগে একটা কথা যদি জানান! আপনি কে? এ হিরের খোঁজ করায় আপনারই বা কী স্বার্থ?'

'আমি!' পরাশরের মুখের চেহারা একেবারে বদলে গেল, 'আমি একজন কবি, গোয়েন্দাগিরি আমার একটা শখ, আর এ ব্যাপারে আমার স্বার্থ বিশেষ কিছু নয়। শুধু দেওয়ানজিকে বাঁচানো। তাঁর একটা কাজ আমি একবার করে দিয়েছিলাম। এবারে ঠিক হিরে জহরতগুলো আনবার সময় হঠাৎ বোম্বাইয়ের ফিল্মের কাজ ছেড়ে যশোবন্তজিকে বিরাটগড়ে গিয়ে হাজির হতে দেখে কিছু একটা গোলমাল হতে পারে সন্দেহ করে তিনি আমায় সব জানিয়ে আগে থাকতে

বোম্বাইয়ে উপস্থিত থাকবার জন্যে গোপনে চিঠি লিখেছিলেন।'

'একটা কথা আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না।' আমি এবার না বলে পারলাম না—'ট্রেন থেকে বোম্বাই পর্যন্ত এত সাবধানতার মধ্যে হিরেটা সরানো হল কী করে? তালাবন্ধ বাকসটাও হয় দেওয়ানজি, নয় রানিসাহেবার কাছে ছিল সারাক্ষণ।'

'সে কথা জিজ্ঞাসা না করাই ভাল।' হেসে বললে পরাশর, 'রানিসাহেবা দেওয়ানজিকে শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস সবই করেন, কিন্তু ভাইয়েদের ওপর অবুঝ স্নেহ মেয়েদের চিরন্তন দুর্বলতা। দেওয়ানজির কড়া খবরদারিতে ভাইকে তার আবদার মতো টাকা দেবার ক্ষমতা নেই। সেই অবস্থায় ভাই যদি এমন একটা ফন্দি জানায় যাতে কারও কোনও ক্ষতি না হয়েও সে বেশ কিছু গুছিয়ে নিতে পারে তা হলে অত্যন্ত ধার্মিক সৎ মহিলাও দুর্বল মুহূর্তে দ্বিধাগ্রস্তভাবে নিমরাজি হয়ে যেতে পারেন। অবশ্য দেওয়ানজিকে যে পুলিশ শেষ পর্যন্ত ধরবে এটা তখন কল্পনা করা যায়নি। তা হলে হয়তো যশোবন্ত দেওয়ের কোনও আবদারই খাটত না।'

রানিসাহেবা আরক্ত মুখে মাথা নিচু করলেন। মিস মলি ফোনটা তাঁর হাতে এগিয়ে দিল।

রানিসাহেবার কাছ থেকে বাসায় ফিরতে ট্রেনে পরাশরকে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বললাম, 'আচ্ছা, এই যদি আসল ব্যাপার তা হলে গোড়া থেকে আমায় এমন বোকা বানাবার মানেটা কী?'

পরাশর হাসল, 'আরে, বোকা না বানিয়ে প্রথমেই সব জানিয়ে দিলে আগাগোড়া ব্যাপারটায় এমন মজা পেতে? এ-ও একরকম কবিতা, বুঝেছ? লাইনগুলো ঠিক পর পর আসা চাই। শেষের লাইন গোড়ায় আনলেই সর্বনাশ। হ্যাঁ, ভালো কথা, অনেকগুলো কবিতা ইতিমধ্যে লিখে ফেলেছি।'

সভয়ে বললাম, 'কবিতা আবার কখন লিখলে এর মধ্যে?'

'লিখেছি হে লিখেছি। রাস্তায় যেতে যেতে নোট বইয়ে কিছু টোকবার ছলে লিখেছি, রাত্রে তুমি ঘুমোলে লিখেছি। কবিতা না লিখলে কি বাঁচা যায়। আজ এখুনি গিয়ে তোমায় শোনাব।'

আমি হতাশভাবে গদিওয়ালা ট্রেনের সিট এ গা এলিয়ে দিলাম।

বোম্বের ইলেকট্রিক ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসের গদিওয়ালা সিটগুলো সত্যিই ভাল, কিন্তু আমার মনে হল যেন সারা গায়ে কাঁটা ফুটছে।

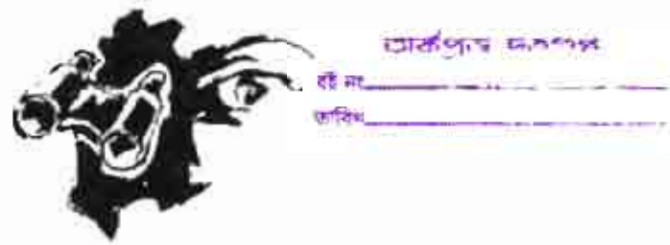

পরাশর বর্মা ও অশ্লীল বই

পরাশরের আবার বাতিক চেপেছে।

মানে কবিতার বাতিক।

বাতিক নিয়ে নিজের মাথাটি চর্বণ করলে তো বলবার কিছু ছিল না, কিন্তু আমার মাথাও সেই সঙ্গে খারাপ করবার জোগাড় করাতেই আপত্তি।

যত বড় শাস্তিই হোক, তার কবিতা শোনা খানিকটা সয়ে এসেছে। তন্ময় হয়ে শোনার ভান

করে চোখ বুজে থাকলেই হল। পরাশর যখন কবিতা পড়ে যায় তখন আমি আকাশপাতাল যা মনে আসে ভাবি।

শেষ হলে পর কখনও সরবে 'বাঃ' বলে, কখনও নীরবে শুধু মুখে চোখে মুগ্ধ বিস্ময় ফুটিয়ে তারিফ করি।

সাধারণত এতদিন এইভাবেই বিপদ কাটিয়ে এসেছি, কিন্তু সম্প্রতি আর এক নতুন উপদ্রব দেখা দিয়েছে।

শুধু তার কবিতা শুনলেই আর রেহাই নেই, তার কবিতার মিল পর্যন্ত এখন জোগাতে হচ্ছে।

'আচ্ছা, যমুনার একটা ভাল দেখে মিল বলো দেখি', দুই হাঁটুর ওপর বাঁধানো খাতাটা রেখে কলম হাতে সে ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকায়।

মিল এখুনি খুঁজে না পেলেও হঠাৎ যমুনাকে নিয়ে তার টানাটানির মানেটা বুঝতে পারি।

যমুনা নদীর ওপর দিয়েই পার হচ্ছি আপাতত।

যমুনার অবশ্য যা চেহারা তাতে কবিতা লেখার উৎসাহের চেয়ে 'তুমি কি সেই যমুনা প্রবাহিনী' বলে আক্ষেপের গানই বেরোয়। তার জলের ধারা বালির চড়ার মধ্যে প্রায় লুপ্ত বললেই হয়। চৈত্র মাসের বিকেলের পড়ন্ত রোদেই চারিদিক যেন মরুভূমির মতো ধু ধু করছে। দিল্লি স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়তেই এইটুকুর মধ্যে এই দৃশ্যে পরাশরের কবিতার কণ্ডুয়ন শুরু হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। কিন্তু কবিতা যে কখন কীসে আসে কিছু বলবার উপায় নেই। দিল্লি স্টেশন ছাড়তে না ছাড়তেই ফোলিও থেকে বাঁধানো খাতাটা বার করে সে কলম হাতে বসে গেছে। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে পরাশর আবার তাড়া দেয়—'কই, বললে না?'

বলি, 'যমুনা ছাড়া আর কোনও মিল তো পাচ্ছি না। এক যদি পদ্মাপারের "কনু না" কোনওরকমে লাগিয়ে দিতে পারো, দেখো।'

'না, না, ওসব তো আগেই ভেবেছি, ওর চেয়ে ভাল একটা কিছু বলো—'

'বাংলা অভিধানে তিন অক্ষরে আর কিছু আছে বলে তো মনে পড়ছে না। তুমি গ্রিক লাতিন একটা কিছু লাগিয়ে দাও-না! তোমাদের কবিতারও তাতে কদর বাড়ে।'

পরাশর হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'না, সেদিন আর নেই।'

'সেদিন আর নেই মানে?' আমি সত্যিই অবাক—'ফরেন এক্সচেঞ্জের কড়াক্কড়িতে ওসব বিদেশি শব্দ আমদানিও বন্ধ নাকি?'

'না, না'—পরাশর আমার মূঢ়তায় বিরক্ত হয়ে ওঠে—'আমরা আজকাল ভোল পাল্টে ফেলেছি। ওসব উটকো শব্দ আর আমাদের কবিতায় পাবে না। এককালে যা ধোঁকা দেবার দিয়েছি, এখন মাথা মুড়িয়ে আমরা সহজ ভাষায় কবিতা লিখি।'

কবিতার রাজ্যের এত খবর আমি রাখি না। একটু দুঃখিত হয়েই বলি, 'কিন্তু তোমাদের কবিতার মানে যে তা হলে সবাই বুঝে ফেলবে! তখন আসল মাল যদি চায়?'

'সেই একটা বিপদ আছে বটে!' পরাশর স্বীকার করলে নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে।

যমুনা নদী পেরিয়ে তখন সাহদারা হয়ে চলেছি। ভেস্টিবিউল ট্রেন। গরমের দরুন এয়ার কন্ডিশন্ড গাড়ির সব সিটই ভর্তি।

যমুনার উপযুক্ত মিল না পেয়েই বোধহয় পরাশর খাতাটা বন্ধ করে বললে, 'চলো, চা খেয়ে আসা যাক।'

কবিতার মিল খোঁজা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সানন্দে তার কথায় সায় দিয়ে উঠে পড়লাম। কিন্তু চা খাওয়া তখনও কপালে নেই। আমাদের কামরাটার পর করিডর দিয়ে আরও দুটো কামরা পেরিয়ে রেস্তোরাঁয় যেতে হয়। সেখানে পৌঁছে দেখি আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান যাত্রীরা আগে গিয়েই সব চেয়ার দখল করে বসে আছে। প্রতি কামরার দু-ধারে করিডরের লাগাও বাইরে বেরোবার ও সিগারেট খাবার ছোট জায়গা। সেইখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া তখন উপায় নেই।

ওই অপেক্ষা করতে গিয়েই মি. রামজীবনের সঙ্গে আলাপ। আলাপ হবার আগেই অবশ্য তাঁর দিকে না হোক, তাঁর হাতের বইটির দিকে দৃষ্টি পড়েছিল। অতি অশ্লীল ধরনের রঙিন ছবিওয়ালা মলাটের একটি সস্তা মার্কিন বই। রেলওয়ে স্টলে ইদানীং এ বইটি প্রায় সর্বত্রই দেখেছি মনে হয়। মলাটের গুণে বিক্রিও যে যথেষ্ট তাতে সন্দেহ নেই।

বই সম্বন্ধে রুচি যেমনই হোক, রামজীবন কিন্তু বেশ মিশুক লোক। আমাদের মতো আরও জন চারেক সেখানে রেস্তোরাঁয় জায়গা না পেয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তার মধ্যে রামজীবনজিই প্রথম নিজে থেকে আলাপ শুরু করে দিলেন—'কী মশাই, এখানে খালি খালি দাঁড়িয়ে থাকবেন? সিগারেট ভি পিবেন না?' নিজের সিগারেট কেসটা খুলে ধরতে ত্রুটি করলেন না। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর দান প্রত্যাখ্যান করলাম, কিন্তু পরাশর আমায় অবাক করে দিয়ে একটা সিগারেট তুলে নিলে।

রামজীবনজি নিজের লাইটার জ্বেলে পরাশরের ও নিজের সিগারেট ধরিয়ে একটু হেসে বললেন, 'এ ট্রেন খুব ভাল আছে। বাকি এই এক ঝামেলা। সিগারেট খেতে বার বার এখানে আসতে হোবে। আমি আবার সিগারেট থোড়া বেশি খাই।'

এরকম আপ্যায়নের পর ভদ্রতা করেও কিছু বলা উচিত বলেই বললাম, 'আপনি তো বেশ বাংলা বলেন!'

রামজীবনজির মুখে একগাল গর্বের হাসি দেখা দিল। বললেন, 'হ্যাঁ, কলকাতায় তো হামেশাই যাই কিনা, তাই ভাষা শিখে নিয়েছি। কেউ কেউ আমাকে বাঙালি বলে ভুল কোরে।'

রামজীবনজির অহংকারটুকুতেই একটু সুড়সুড়ি দিয়ে বললাম, 'তা তো করতেই পারে। তা কলকাতায় আপনার ব্যবসাটাবসা আছে বুঝি?'

রামজীবনজি একটু হেসে বললেন, 'ব্যবসা নেই। আমি দালালি করি, তাই বোম্বাই দিল্লি মাদ্রাজ কলকাতা সব জায়গা ঘুমতে হয়।'

আমাদের ভাগ্য ভাল। ঠিক এই সময়ে একটি দল রেস্তোরাঁর একটা টেবিল ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই আমরা তিনজনেই একসঙ্গে জায়গা পেয়ে গেলাম।

রামজীবনজি সদাশয় লোক। কোনও আপত্তি না শুনে আমাদের তিনজনের জন্যই চা টোস্টের অর্ডার দিয়ে আবার আলাপ শুরু করলেন, 'আপনারা দিল্লি বেড়াইতে এসেছিলেন বুঝি?'

পরাশরের সঙ্গে যে কারণে দিল্লিতে এই গরমে এসেছিলাম তা ঠিক যেখানে সেখানে বলবার নয়। তাই তাঁর কথাতেই সায় দিতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ পরাশর হেসে উঠে বললে, 'এই গরমে কেউ দিল্লি বেড়াতে আসে মশাই! এসেছিলাম একটু গোয়েন্দাগিরি করতে!'

'গোয়েন্দাগিরি!' রামজীবন যতখানি অবাক আমি ততোধিক। নিজেকে কবি বলে প্রচার করবার এমন সুযোগ পেয়েও পরাশর নিজের গোয়েন্দাগিরির কথাই অমন বেহায়ার মতো প্রকাশ করবে এ আমার কল্পনাতীত।

কিন্তু পরাশরের মাথায় মাঝে মাঝে পোকা ঢোকে বোধহয়। কোনও স্বাভাবিক মাত্রাজ্ঞান আর তার থাকে না।

এমনিতেই কথাগুলো বেশ জোর গলায় বলায় আশপাশের টেবিলের অনেকের নজর তখন আমাদের দিকে পড়েছে। কারও মুখের চেহারায় মৃদু কৌতূহল বা কৌতুক, কারও বা স্পষ্ট বিদ্রূপ। এর ওপর আমায় লজ্জায় একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে পরাশর সগর্বে বলতে শুরু করলে, 'হ্যাঁ, কাগজে চোরাই সোনা আমদানির সেই মস্ত কেসটার কথা পড়েননি? এই কালই, সে দলের বড় একজন চাঁই দিল্লিতে হঠাৎ অ্যাকসিডেন্টে মারা পড়ায় তাদের অনেক কীর্তি ফাঁস হয়ে গেছে। লোকটা বিদেশি টুরিস্ট। লেবাননের একজন ইহুদি। মারা যাবার আগে সে পুলিশকে কিছু গোপন খবর দিয়ে বলে গেছে যে তার মৃত্যু সাধারণ

দুর্ঘটনা নয়। দলের লোকের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় তারা এইভাবে তাকে মোটর দুর্ঘটনার ছল করে খুন করেছে।'

আমার তো ধরণী দ্বিধা হও গোছের অবস্থা।

রেস্তোরাঁর কামরাটি বিশেষ বড় নয়। গোয়েন্দার উল্লেখ শুনে সামান্য দু-চারজন কৌতূহলী হয়েছিল মাত্র, এখন কামরার প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আমাদের দিকে।

পাশের টেবিলের সাহেবি পোশাক পরা এক ভদ্রলোক স্পষ্টই বিদ্রূপের স্বরে এবার জিজ্ঞাসা করলেন ইংরেজিতে, 'তা আপনি সেখানে কি গোয়েন্দাগিরি করতে গেছলেন?'

'আমি!' পরাশরের চেহারায় আর গলায় সে কী দম্ভ! 'আমি কলকাতা থেকে গেছলাম কিছু পরামর্শ দিতে।'

'পরামর্শ দিতে? দিল্লিতে?' সে ভদ্রলোকের সঙ্গে আরও দু-চার জনের ভুরু কপালে উঠল দেখলাম।

এক টেবিল থেকে আর একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কলকাতার সি আই ডি অফিসার তা হলে?'

সগর্বে একটু হেসে পরাশর বললে, 'না, আমি শখের গোয়েন্দা!'

এবার এদিক ওদিক থেকে চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল!

'ওঃ, শখের গোয়েন্দা, প্রাইভেট স্লুথ্?' যে ভদ্রলোক বললেন, তাঁর কথার ধরনে এবার হাসিটা বেশ জোরেই উঠল চারিদিক থেকে। কিন্তু পরাশরের একেবারে দু কান কাটা। লজ্জা পাওয়া দূরে থাক সে অম্লান বদনে উঠে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে কামরা সুদ্ধ সকলকে মাথা নুইয়ে নতি জানিয়ে বললে, 'অ্যাট ইয়োর সার্ভিস্ জেন্টেলমেন, পরাশর ভার্মা দি হিউম্যান এক্স রে!'

pathagar.net

চারিদিক থেকে এবার হাসির রোল উঠল।

তার আহাম্মকিতে অস্বস্তি বোধ করছিলাম, এবার ভাঁড়ামিতে গা একেবারে জ্বলে গেল। নেহাত ব্যাপারটা আরও বিশ্রী দেখাবে তাই—নইলে তখুনি টেবিল ছেড়ে উঠে চলে যেতাম। নিরুপায় হয়ে গম্ভীর হয়ে শুধু মাথা নিচু করে বসে রইলাম।

কিন্তু আমার রাগ কি কামরার অন্য সবাইকার বিদ্রূপ, পরাশরের কোনও কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই।

নির্বিকারভাবে চেয়ারে বসে সে রামজীবনজির সঙ্গেই আবার আলাপ জুড়ে দিলে, 'আপনার চা সিগারেট সব ধ্বংস করছি, অথচ আপনার নামটাই তো এখনও জানা হয়নি!'

পরাশরের কাণ্ডকারখানা দেখে রামজীবনজিও একটু বোধহয় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি একটু যেন ইতস্তত করেই সংকুচিতভাবে নিজের নামটা এবার আমাদের জানালেন।

পরাশর হঠাৎ তাঁর হাতের বইটা টেনে নিয়ে বললে, 'বাঃ! বড় মজাদার বই মনে হচ্ছে। এসব বই আপনি খুব পড়েন বুঝি?'

রামজীবনজিকে এবার বেশ অপ্রস্তুত মনে হল। সলজ্জভাবে আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'আরে না মশাই, ট্রেনে পড়বার জোন্যে একটা ডিটেকটিভ কিতাব কিনেছিলাম। স্টলওয়ালা প্যাকেট বেঁধে হাতে দিয়ে দিল। তারপর ট্রেনে উঠে প্যাকেট খুলে দেখি এই কিতাব!'

'তাও তো একটা ছেঁড়া বই আপনাকে গছিয়ে দিয়েছে দেখছি।' পরাশর বইটা খুলে ধরতে দেখা গেল সত্যিই বাঁধাইয়ের দোষে বইয়ের মলাটটা প্রায় আলগা হয়ে এসেছে।

স্টলওয়ালা তাঁকে সত্যিই ঠকিয়ে থাকুক বা শখ করেই বইটে কিনে এখন লজ্জা ঢাকতে ও গল্প তাঁর বানানো হোক, রামজীবনজি বইটির আলোচনা বন্ধ করতেই ব্যস্ত মনে হল। তাড়াতাড়ি পরাশরের হাত থেকে বইটা টেনে নিয়ে তিনি বললেন, 'যেতে দিন মশাই। ভারী তো কিতাব। ট্রেনে পড়া হলেই ফেলে দিব। এসব বই কেনাই লুকসান।'

চা খাওয়া শেষ করে রেস্তোরাঁ থেকে নিজেদের কামরায় যেতে যেতে কিন্তু বুঝলাম রামজীবনজি যাই বলুন, ও বই কেনা লোকসান বলে অনেকেই মনে করেন না। পথে যে দুটি কামরা পড়ে তার দু-ধারের সিটে অন্তত চারজনের হাতে ওই বই চোখে পড়ল। বইয়ের আকর্ষণও কিছু আছে নিশ্চয়। কারণ যাঁদের হাতে বইটি দেখলাম তাঁরা সবাই পড়ায় একেবারে তন্ময় মনে হল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাশরেরও ওই ছোঁয়াচ লাগবে ভাবতে পারিনি। সন্ধেবেলা আলিগড়ে ট্রেন থামতেই সে ব্যস্ত হয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল আমায় কিছু না বলেই। অনেকক্ষণ বাদে প্রায় ট্রেন ছাড়বার সময় যখন ফিরে এল তখন দেখি তার হাতেও ওই বই।

চায়ের টেবিলের ওই কেলেঙ্কারির পর বেশ গম্ভীর হয়েই ছিলাম এতক্ষণ। সে দু-চারবার কথা বলবার চেষ্টা করলেও তেমন সাড়া দিইনি। এবার কিন্তু নিজের বিরক্তিটা আর প্রকাশ না করে পারলাম না। বেশ একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বললাম, 'তুমি ওই বই কিনতে গিয়েছিলে?'

আমার গলার স্বর ও মুখের চেহারা যেন লক্ষই না করে পরাশর এই বই কিনতে পারার সৌভাগ্য বর্ণনা করতেই মেতে উঠল। 'আরে স্টলওয়ালা কি সহজে দিতে চায়! বলে—নেই, ফুরিয়ে গেছে। শেষে এক টাকা বেশি দাম দেব বলতে লুকোনো জায়গা থেকে বার করে দিলে!'

'এক টাকা বেশি দাম দিয়ে তুমি ওই বই কিনলে? তোমার লজ্জা করে না?' গলায় যতখানি সম্ভব ঘৃণা ঢেলে দিয়ে বললাম।

কিন্তু পরাশর তাতেও নির্বিকার! 'বাঃ! লজ্জা কীসের! সবাই যখন পড়ছে, কী আহামরি জিনিস একবার দেখতে হবে না?'

এর পর বাক্যব্যয় নিষ্ফল বলেই কাচের জানলার পরদাটা তুলে দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। উত্তর প্রদেশের ধূ ধূ সমতল প্রান্তর ছাড়াও দিনের বেলাতেও সেখানে এখন দেখবার কিছু নেই। রাত্রের অন্ধকারে মাঝে মাঝে পার হয়ে যাওয়া গ্রামের কয়েকটা আলোর ফোঁটাই শুধু দেখা যাচ্ছিল।

আরও কতক্ষণ এইভাবে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারতাম বলতে পারি না, কিন্তু এরই মধ্যে রামজীবনজি একটি অ্যাটাচি হাতে উত্তেজিতভাবে আমাদের কাছে এগিয়ে আসছেন দেখা গেল।

দূর থেকে তাঁর গলা শুনেই মুখ ফিরিয়ে তাকালাম।

'শুনছেন মশাই, শুনতে আছেন?' উত্তেজনাতেই তাঁর বাংলা আর একটু তখন বিকৃত হয়ে গেছে। 'এই বন্ধো ট্রেনমে ভি বদমাশ চোর আছে!'

'চোর?' পরাশর বইটা মুড়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী চুরি গেছে আপনার?'

'হামারা অ্যাটাচি কেস!'

হেসে বললাম, 'আপনার হাতে তা হলে ওটা কী?'

'আরে ইয়ে হামার নেই। কোই বদল কোরিয়ে লিয়েছে।' রামজীবনজির মুখের ভ্রুকুটি কেটে গিয়ে হঠাৎ কিন্তু হাসি দেখা দিল! 'লেকিন শ্বশুরাকে বেটা বিলকুল ঠকিয়ে গিয়েছে। অ্যাটাচিতে হামার কিছু ছিল না। সিরিফ কিছু ফালতু চিঠি-উঠির কাগজ। আর এ অ্যাটাচিতে—' এই বলে রামজীবনজি অ্যাটাচিটা খুলে ফেলে যা বার করলেন তাতে তাঁর পক্ষে খুশি হওয়াই স্বাভাবিক। জিনিসটি রুপোর বেশ দামি একটা বড় সিগারেট কেস। কেসটি আবার সিগারেটে ভরতি!

'তা হলে তো আপনার লাভই হয়ে গেছে!' পরাশর ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দিতে চায় দেখলাম।

কিন্তু ব্যাপারটা অত তাচ্ছিল্য করবার নয় বলেই আমার মনে হল। জিজ্ঞাসা করলাম,

'অ্যাটাচিতে আর কী আছে? কোনও নামের কার্ডটার্ড বা এমন কোনও কাগজপত্র যাতে জিনিসটা কার বোঝা যায়!'

'না, কিছু না। খালি এই দেখেন!' বলে রামজীবনজি যা বার করলেন তাতে অবাক হওয়ার সঙ্গে একটুও হাসিও পেল।

সেইরকম অশ্লীল মলাটের অন্য একটি বই!

পরাশরের দিকে একটু কটাক্ষ করেই বললাম, 'আপনাদের মতো এসব বইয়ের আরও অনেক সমঝদার এ ট্রেনে আছে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অ্যাটাচিটা ট্রেনে ওঠবার সময় ভুলে কারও সঙ্গে বদল হয়ে যায়নি তো?'

'না, তা হতে পারে না। কুলির কাছে মাল দিয়ে আমি তো অ্যাটাচি নিজের হাতে নিয়ে ট্রেনে উঠেছি। তার পর আমার কিতাবের প্যাকেট ভি অ্যাটাচি থেকে বার করে খুলেছি! যখন চা পিতে গিয়েছিলাম জরুর তখন কেউ বদল কোরেছে!'

'যাক, লোকসান যখন কিছু হয়নি চলুন রাত্রের খাওয়াটা সেরে নিই গিয়ে' বলে ব্যাপারটায় কোনও গুরুত্ব না দিয়েই পরাশর উঠে পড়ল।

রামজীবনজি একটু আপত্তি জানালেন, 'আরে—এরই মধ্যে খাইতে যাবেন কী!' তার পর আসল কারণটাও প্রকাশ করে ফেললেন—'সাড়ে নও বাজে তো সব বত্তি বুতিয়ে দেবে। কিতাবটো তার আগে পড়ে লিতে চাই।'

'কিতাব খেতে খেতেই পড়বেন চলুন। এই তো আমিও বই নিয়ে যাচ্ছি সেই জন্যে। গাড়ির ভিড় তো দেখছেন, পরে আর খাবার ঘরে জায়গাই পাবেন না।'

পরাশর একরকম জোর করেই রামজীবনজিকে ঠেলে নিয়ে চলল রেস্তোরাঁর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বাধ্য হয়ে আমাকেও যেতে হল।

অ্যাটাচি বদল হওয়ায় কোনও ক্ষতি না হলেও রামজীবনজির কপালে সেদিন অন্য দুর্ভোগ ছিল।

অত আগে যাওয়া সত্ত্বেও রেস্তোরাঁর একেবারে শেষ দিকের একটা টেবিলে আমরা জায়গা পেলাম।

রামজীবনজির চা খাওয়ানোর প্রতিদান হিসেবে তাঁর কোনও ওজর আপত্তি না শুনে পরাশর তিনজনের জন্য ডিনার অর্ডার দিলে। রামজীবনজি পোশাকে রাজস্থানি হলেও খাদ্য সম্বন্ধে জানা গেল উদার। আমিষ নিরামিষে তাঁর সমান রুচি।

কেলেঙ্কারি হল প্রথমে সুপ দেবার সময়েই। সংকীর্ণ জায়গায় পরিবেশন করতে গিয়ে রেস্তোরাঁর বয়ের হাত থেকে অসাবধানে একটা সুপের প্লেট গেল পড়ে। রামজীবনজির মাথার ওপর যে গরম সুপ পড়েনি এই ভাগ্য। কিন্তু পায়ের দিকে খানিকটা ছিটকে লেগে জুতো, কাপড় ও গলাবন্ধ কোটের কিছুটা গেল নষ্ট হয়ে। রামজীবনজি চমকে অস্ফুট চিৎকার করে ওঠার সঙ্গে পরাশর একেবারে হাঁ হাঁ করে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তাঁর দিকে, তার পর বয়কে যা নয় তাই বলে গাল দিয়ে এই মারে তো সেই মারে!

বয় যত বলতে চায়—'সাব মেরা কুছ কসুর নেই'—তত সে আরও গরম হয়ে ওঠে।

শেষে আমাকেই বাধা দিয়ে বলতে হল, 'আরে, সত্যি বয়ের তো তেমন দোষ নেই। তুমি অত হাত-পা নেড়ে চোরাই সোনা চালানের গল্প না শুরু করলে তো এই কাণ্ডটি হয় না।'

'আমার গল্প বলারই দোষ হল!' পরাশর দস্তুরমতো ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, 'বেশ আমিই মাফ চাইছি সকলের কাছে!'

পরাশর সেই যে গুম হয়ে বসল, আমার কি রামজীবনজির কোনও কথাতেই তার মেজাজ আর বদলানো গেল না।

এর ওপর আবার বিল দেবার সময় নগদ দুটো টাকা বয়কে বকশিশ দিয়ে জানালে তাকে

মিছিমিছি বকার জন্যে বকশিশ।

বয় আমাদেরই মতো তাজ্জব।

রামজীবনজি ও আমি এই ছেলেমানুষিতে একটু হাসলাম মাত্র।

খাওয়ার টেবিল থেকে নিজেদের সিট-এ এসেও পরাশরের সে ভাব গেল না।

টুণ্ডলা স্টেশন তখন পার হয়ে গিয়েছি। রাত প্রায় সাড়ে আটটা। এত তাড়াতাড়ি ঘুমোবার চেষ্টা বৃথা বলে সঙ্গে আনা খবরের কাগজটাই পড়বার জন্যে বার করলাম। পরাশর তখন তন্ময় হয়ে তার নতুন কেনা বইটাই পড়ছে।

সেই বইয়ের মলাটের দিকে চেয়ে নিজের অজান্তেই একটু ভ্রুকুটি বোধহয় করে ফেলেছিলাম।

পরাশর গম্ভীর মুখে আমার দিকে ফিরে বললে, 'ওঃ! তোমার অসহ্য লাগছে—না? গাড়িতে আর তো কোনও সিট খালি নেই, নইলে উঠে যেতাম।'

এবার একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'কী ছেলেমানুষি করছ বলো তো! আমি তোমাকে উঠে যেতে বলেছি? বইটা দেখলে সত্যি গা ঘিনঘিন করে এটা আর কী করে লুকোব বলো!'

'গা ঘিনঘিন করে তো শুধু এই মলাটের জন্যে!' বলে পরাশর হঠাৎ মলাট দুটো সশব্দে ছিঁড়ে ফেলে নিজের ব্যাগের মধ্যে রেখে বললে, 'হয়েছে এখন?'

হেসে ফেলে বললাম, 'হয়েছে।'

পরাশরের ভাগ্যে বই পড়া কিন্তু সেদিন নেই। রামজীবনজি রেস্তোরাঁ থেকে তাঁর সিট-এ ফেরেননি। আসবার পথে বাথরুমে ঢুকে তারপর বোধহয় কামরার বাইরে সিগারেট খাচ্ছিলেন।

হঠাৎ তাঁকে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে আসতে দেখা গেল।

'দেখেছেন মশায়, দেখেছেন তাজ্জব কাণ্ড!' বলে তিনি আমাদের সিট-এর কাছে এসে দাঁড়ালেন।

pathagar.net

'আবার কী তাজ্জব কাণ্ড হল?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'আরে মশায়, আমার সে কিতাবটা কে চোরি করিয়ে লিয়েছে।'

'সে কী? খাবার টেবিল থেকে ওঠবার সময়েও তো সে বই আপনার হাতে ছিল দেখেছি।'

'হ্যাঁ, হাতে তো ছিল। সিগারেট পিয়ে বাইরের বেসিনে ফির মু ধোতে গিয়ে ওই বেঞ্চির ওপর রেখেছিলাম। মু ধোয়ে দেখি, কিতাব আর নেই।'

হেসে বললাম, 'ও বই পড়ে থাকতে দেখলে কেউ লোভ সামলাতে পারে!'

রামজীবনজির তখন রসিকতা উপভোগ করবার মতো অবস্থা নয়। হতাশভাবে বললেন, 'এখোন আমি করি কী?'

'কী আর করবেন!' পরাশর গম্ভীর ভাবেই বললে, 'ও বই তো গাড়ির অনেকের হাতেই দেখলাম। বইয়ে তো আপনার নাম লেখা নেই যে কাউকে ধরবেন।'

'না, ধরতে আমি চাই না। লেকিন কিতাবটা খালি আধা পড়েছি তাই খারাপ লাগছে।' একটু ইতস্তত করে রামজীবনজি তাঁর আসল অভিপ্রায়টি জানালেন, 'আপনার কিতাবটো যদি দেন। আমি পড়ে লিয়েই দিয়ে দিব।'

পরাশর এ অনুরোধ অমন সহজেই রাখবে ভাবতে পারিনি। হাতের বইটা রামজীবনজির হাতে অম্লান বদনে তৎক্ষণাৎ দিয়ে বললে, 'বেশ, তাই নিন!'

রামজীবনজি বইটা হাতে নিয়ে একটু বিমূঢ়ভাবে বললেন, 'এটা কী কিতাব? সব তো ছিঁড়া আছে।'

'ছেঁড়া শুধু মলাটটাই। নইলে বই যা তা ঠিকই আছে!' বলে আশ্বাস দিলেও রামজীবনজি ঠিক সন্তুষ্ট হয়ে বইটি নিয়ে গেলেন বলে মনে হল না।

রাত সাড়ে ন-টায় এটাওয়া স্টেশন পার হবার পর গাড়ির সাধারণ আলো নিবে গিয়ে নিতান্ত

কাজ চলবার মতো ম্লান সবুজ আলো জ্বলে ওঠবার পর সব প্রথমে রামজীবনজির কথা ভেবেই দুঃখ হল। তাঁর অত সাধের বই এর মধ্যে নিশ্চয়ই তিনি পড়ে শেষ করতে পারেননি।

কিন্তু তিনি গেলেন কোথায়? কামরার দু-পাশে দু-সারিতে সমস্ত সিট বসানো। এক সারিতে দুটি করে সিট, অন্য সারিতে ঠিক উলটো মুখ করে সাজানো তিনটি করে পর পর সিট। মাঝখানে যাতায়াতের কার্পেট পাতা পথ। আমরা দু সিট-এর সারিতে বসেছি। আমাদের উলটো সারিতে প্রায় কামরার দরজার কাছাকাছি রামজীবনজির সিট ঠিক মাঝখানের রাস্তার পাশেই। সে সিট দেখলাম খালি!

বই পড়বার জন্যে সিট ছেড়ে সেই বাইরের সিগারেট খাবার জায়গায় তিনি গিয়ে বসেছেন তা হলে! ট্রেন থেকে নামবার ওঠবার দু-দিকের দরজা যেখানে—কামরার জোরালো বাতি নিবে যাবার পরও—সেখানে সারারাত আলো থাকে। একদিকের দেওয়ালে কব্জা দিয়ে আঁটা একটা বেঞ্চিও সেখানে খুলে পাতা যায়। বইয়ের নেশায় রামজীবনজি সেইখানেই গিয়ে বসেছেন ভেবে একটু কৌতুকই অনুভব করলাম।

এর পর কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলতে পারি না। প্রত্যেক সিট-এর চেয়ারের পিছনে অনেকখানি হেলানো যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিটগুলো বসার পক্ষে যতটা আরামে ততটা শুয়ে ঘুমোবার পক্ষে নয়।

এই অসুবিধের জন্যই ঘুমটা হঠাৎ এক সময়ে ভেঙে গেল। কামরাটা একটু বেশি ঠান্ডা করার দরুন বেশ শীত শীত করছে। হাতঘড়িতে দেখি রাত প্রায় সওয়া একটা। সাড়ে এগারোটা নাগাদ ট্রেন কানপুরে আসে। বুঝলাম কানপুরও তা হলে পার হয়ে এসেছি।।

পাশে পরাশরের দিকে চাইলাম। কখন হোল্ডঅল থেকে একটা গায়ের কাপড় বার করে আগাপাস্তলা মুড়ি দিয়ে সে বেশ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ রামজীবনজির কথা মনে পড়ায় তাঁর সিট-এর দিকে চেয়ে অবাক হলাম। এখনও তিনি ফেরেননি!

একটু কৌতূহলী হয়েই পরাশরের পা দুটো ডিঙিয়ে কামরার বাইরে গেলাম।

আশ্চর্য ব্যাপার! রামজীবনজি সেখানেও নেই।

হয়তো অন্য কোনও কম্পার্টমেন্টের পাশের জায়গায় গিয়ে বসেছেন ভেবে গোটা ট্রেনটাই ঘুরে দেখে এলাম। কোনও কামরার একটা সিটও খালি নেই। নিজের নিজের চেয়ার হেলিয়ে নানা ভঙ্গিতে নানাজনে ঘুমোচ্ছে বা ঘুমোবার চেষ্টা করছে। কিন্তু রামজীবনজিকে কোথাও দেখতে পেলাম না।

বেশ একটু ভাবনাই হল এবার। পরাশরকে একথা এখন জানাতেই হয়। কিন্তু তার আগে একেবারে নিঃসংশয় হবার জন্য এক-এক করে সব ক-টা বাথরুমের দরজাও খুলে দেখলাম। সব বাথরুমই খালি।

দরজার হাতলে আউট-অফ-অর্ডার লেখা একটা নোটিশ ঝুলোনো থাকার দরুন শুধু একটি বাথরুম এ পর্যন্ত খোলবার চেষ্টা করিনি।

শেষ পর্যন্ত সেটার দরজাও ঠেলে খুলে ফেললাম।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর শিউরে উঠল।

না, কোনও লাশ সেখানে পড়ে নেই, কিন্তু যা আছে তা-ও কম ভয়াবহ নয়।

বাথরুমের মেঝের ওপর একরাশ কাগজকুচির সঙ্গে রক্তমাখা একটা ধুতি ও গলাবন্ধ কোট পড়ে আছে। গলাবন্ধ কোটটি দেখেই রামজীবনজির বলে চিনলাম।

আমার অবস্থা তখন বর্ণনা করা শক্ত। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ছুটতে ছুটতে পরাশরের কাছে গিয়ে তাকে জাগাবার চেষ্টা করলাম—'শুনছ পরাশর, শুনছ! ওঠো শিগগির!'

আমার উত্তেজিত চিৎকারে আশপাশের অনেকেই তখন জেগে উঠেছেন। তাঁদের সকলের মুখেই প্রশ্ন—'কী হয়েছে মশাই, হয়েছে কী?' উত্তর না দিয়ে পরাশরকেই আবার জাগাবার

চেষ্টা করলাম। কিন্তু পরাশরের ঘুম আর ভাঙতেই চায় না।

শেষে সজোরে তাকে নাড়া দিতে সে কোনওরকমে আড়ামোড়া ভেঙে হাই তুলে একটু বিরক্তির স্বরেই বললে, 'ব্যাপার কী? রাতদুপুরে এমন চেঁচামেচি করছ কেন?'

'সর্বনাশ হয়েছে পরাশর, শিগগির দেখবে চলো!'

জেগে উঠতে তখন আর আর কারও বাকি নেই। অনেকে সিট ছেড়ে আমাদের সিট-এর কাছে পর্যন্ত ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসেছেন। পরাশরেরই শুধু ঘুমের ঘোর আর কাটতে চায় না। ঘুম জড়ানো কণ্ঠে সে বললে, 'কী দেখব কী? খুন জখম কেউ হয়েছে?'

'তা-ই হয়েছে মনে হচ্ছে। রামজীবনজি ট্রেনের কোথাও নেই।'

আমি কিছু বলবার আগেই পরাশর তেমনই জড়িত স্বরে বললে, 'বাথরুমগুলো দেখেছ?'

'তাই দেখেই তো বলছি! একটা বাথরুমে রক্তমাখা তাঁর কাপড়জামা শুধু পড়ে আছে।'

এক মুহূর্ত চুপ হয়ে গিয়ে সমস্ত কামরা গোলমালে যেন ফেটে যাবে মনে হল। বাইরে থেকে দু-জন কন্ডাক্টার গার্ড সে গোলমাল শুনে ছুটে এলেন।

'কী হয়েছে এখানে? কীসের এত গণ্ডগোল?'

'খুন হয়েছে, মশাই! মানুষ খুন!' চার-পাঁচজন নিজে থেকেই বলে উঠলেন। সেই সঙ্গে নানা প্রশ্ন মন্তব্য টিপ্পনিও শোনা গেল।

'কে খুন হয়েছে, কে?' 'লাশ কোথায়?' 'কামরার আলো এখুনি জ্বালা দরকার।'

একজন কন্ডাক্টার গার্ড গিয়ে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থাই করে এলেন।

সমস্ত ট্রেনই তখন উত্তেজিত চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

কে একজন বিদ্রূপ করে বললেন, 'হিউম্যান এক্স-রে থাকতে আমাদের ভাবনা কী! কই মশাই, খুন শুনেই ভড়কে গেলেন নাকি? একটু গা তুলে দেখবেনই চলুন-না।'

লজ্জায় তখন আমার মাটিতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। পরাশরের নিজের আহাম্মকির জন্যই এখন আমাদের এই লাঞ্ছনা। রাগের সঙ্গেই তার হাতটা সজোরে টেনে বললাম, 'ওঠো-না একবার!'

পরাশর নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই এবার উঠে পড়ে বললে, 'চলো, তা হলে দেখেই আসি।'

ট্রেনসুদ্ধ লোকই সঙ্গে যাবার জন্য ব্যাকুল। তাদের ভেতর দিয়ে কোনওরকমে ঠেলেঠুলে পরাশরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাথরুমের দরজাটা খুলে দেখলাম।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে প্রবল গুঞ্জন উঠল। তারই মধ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপও যথেষ্ট।

'কিন্তু মানুষটা গেল কোথায়? হিউম্যান এক্স-রে কী দেখছেন?'

'সমস্ত গাড়িটা এখনই খানাতল্লাশি করা দরকার।' 'না হে না, লাশ নিশ্চয় গাড়ির বাইরে ফেলে দিয়েছে!' 'অ্যামেচার ডিটেকটিভ কী মীমাংসা করলেন?'

ভেবেছিলাম পরাশর জামাকাপড়টা নিশ্চয় পরীক্ষা করে দেখবে। কিন্তু একবার নিচু হয়ে শুধু ছেঁড়া কাগজের একটা টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে পরাশর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে দাঁড়াল। একটু হেসে বললে, 'আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আর খানিক বাদেই সবকিছু জানতে পারবেন।'

'আর খানিক বাদে মানে? আপনি ততক্ষণ গবেষণা করবেন বুঝি?' দু-চারজন হেসে উঠলেন।

'না, গবেষণা আমার হয়ে গেছে।' পরাশর ক্লান্তভাবে একটা হাই তুলে বললে, 'আড়াইটার সময় ট্রেন এলাহাবাদে পৌঁছোবে। আশা করছি সেখানেই এ রহস্যের মীমাংসা হয়ে যাবে।' হাতের ঘড়িটা দেখে সে আবার বললে, 'আর তো মাত্র আধঘণ্টা বাকি!'

সে আধঘণ্টা কী উদ্‌বেগে যে কাটালাম বলতে পারি না। ট্রেনের কারও চোখেই বোধহয় তখন ঘুম নেই। যে বাথরুমে রামজীবনজির জামাকাপড় পড়ে ছিল তার দরজায় একজন কন্ডাক্টার গার্ড পাহারায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা যে যার সিট-এ বসে—ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি।

আমার দুর্ভাবনা শুধু রহস্য নিয়ে নয়, পরাশরের আস্ফালন মিথ্যে প্রমাণ হয়ে গেলে কী ব্যঙ্গ বিদ্রুপ যে সইতে হবে সারা রাস্তা, তাই ভেবেও।

ট্রেন যথাসময়ে এলাহাবাদ স্টেশনে পৌঁছোল। গাড়ি থামতে না থামতেই রেলওয়ে পুলিশের একজন বড় অফিসারকে কয়েকজন পুলিশ নিয়ে ভেতরে এসে ঢুকতে দেখে সবাই আমরা অবাক।

ট্রেনে তো টেলিগ্রাফে বা বেতারে খবর পাঠাবার কোনও ব্যবস্থা নেই। পুলিশ তা হলে খবর পেল কী করে!

পুলিশ অফিসার ট্রেনে উঠতেই কন্ডাক্টার গার্ড তাঁকে নিরুদ্দিষ্ট যাত্রীর কথা বলে বন্ধ বাথরুমটার দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অফিসার সেদিকে একবার একটু ভ্রুকুটি করে সোজা আমাদের কম্পার্টমেন্টেই এসে ঢুকলেন। পেছনে তাঁর দু-জন পুলিশ অনুচর।

স্প্রিং দেওয়া দরজা বন্ধ হবার পর এদিক ওদিক একটু চেয়ে তিনি একেবারে আমাদের সিট-এর কাছে এসেই থামলেন। কামরার সবাই আমারই মতো রুদ্ধ নিশ্বাসে তখন অপেক্ষা করছে।

পুলিশ অফিসার পরাশরকেই গম্ভীরভাবে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা তো তেত্রিশ নম্বর সিট? আপনিই মি. ভার্মা?'

পরাশর মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললে, 'ভার্মা নয়, বর্মা। পরাশর বর্মা।'

পুলিশ অফিসার গম্ভীর মুখে এ সংশোধন গ্রাহ্য না করেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিই আলিগড় থেকে কানপুরের রেলওয়ে পুলিশে টেলিগ্রাম করেছিলেন?'

কামরার সবাই আমারই মতো হতভম্ব।

পরাশর বেশ একটু ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'হ্যাঁ করেছি, কিন্তু তাতে ফল কিছু হয়েছে?'

হঠাৎ পুলিশ অফিসারের চেহারাই গেল বদলে—রূঢ় গাম্ভীর্যের জায়গায় একগাল হাসি। উচ্ছ্বসিতভাবে পরাশরের হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'হয়েছে, মি. ভার্মা। আপনি যা বলেছিলেন ঠিক তাই হয়েছে। আর তার জন্যেই কানপুরের রেলওয়ে পুলিশের তার পেয়ে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি।'

এই করমর্দনের উচ্ছ্বাসের মধ্যে আমরা সবাই তখন বেকুব হয়ে গেছি। পরাশর কখন কী টেলিগ্রামই বা করল, আর কানপুরের রেল পুলিশের এত কৃতজ্ঞতা জানাবারই কেন ধুম পড়ল কিছুই বুঝতে পারলাম না। এরই মধ্যে একজন ভদ্রলোক একটু সাহস করে এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনাদের খুব তো বাহবা দেওয়া চলেছে, এ ট্রেন থেকে একজন যাত্রী যে নিরুদ্দেশ তা জানেন! জানেন তার রক্তমাখা জামাকাপড় একটা বাথরুমে পাওয়া গিয়েছে!'

পুলিশ অফিসার চমকে উঠে বললেন, 'সে কী!' তার পর পরাশরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী মি. ভার্মা?'

পরাশর তাচ্ছিল্যভরে হেসে বললে, 'ও কিছু না!'

কিছু না! সবাই আমরা একেবারে থ। কিন্তু অফিসার সাহেব তৎক্ষণাৎ পরাশরের কথাই একেবারে বেদবাক্য বলে মেনে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তাও তো বটে, কিছু হলে আর আপনি চুপ করে থাকতেন!' তার পর আর একবার হাত ঝাঁকানি দিয়ে বিদায় নিতে গিয়ে হঠাৎ আবার ফিরে দাঁড়ালেন, 'ও, ভুলেই যাচ্ছিলাম, কানপুরের পুলিশকে আপনি যেন কী আসল জিনিসের কথা জানিয়েছিলেন?'

পরাশর হঠাৎ নিচু হয়ে তার ব্যাগ থেকে যা এবার বার করে আনল তাতে সত্যিই আমাদের সকলের চক্ষুস্থির।

সেই অশ্লীল বইটার দুটো মলাট।

অফিসর সাহেবও এবার বেশ একটু বিমূঢ় হয়ে গেছেন মনে হল। এতক্ষণে বোধহয় পরাশরের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে তাঁর কিঞ্চিৎ সংশয় উপস্থিত হয়েছে। সন্দিগ্ধভাবে মলাট দুটির দিকে চেয়ে তিনি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই—মানে—এই সেই আসল জিনিস?'

'হ্যাঁ, আপনি নির্ভয়ে নিয়ে যেতে পারেন। দিল্লিতে শুধু এ ছেঁড়া মলাট দুটো পাঠিয়ে দিলেই তারা এর মর্ম বুঝবে!' বলে পরাশর মলাট দুটো প্রায় জোর করেই তাঁর হাতে গুঁজে দিল।

সে মলাট দুটো নিয়ে অফিসর যেভাবে এবার চলে গেলেন তাতে পরাশরের কথায় তাঁর খুব বিশ্বাস হয়েছে বলে মনে হল না।

ট্রেন থেকে নামবার সময় কন্ডাক্টার গার্ড এবং আরও দু-চারজন যাত্রী আর একবার সেই বন্ধ বাথরুমের দিকে তাঁকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু অফিসর সাহেব কোনও কথায় কান না দিয়ে যেন আচ্ছন্নের মতো নেমে গেলেন।

পুলিশ অফিসর নেমে যাবার মিনিট খানেকের মধ্যেই ট্রেন ছেড়ে দিল। যেখানে যে ছিলেন সবাই তখন পড়লেন পরাশরকে নিয়ে।

'বলি, ব্যাপারটা কী খুলে বলবেন মশাই? আমাদের সকলকে তো বোকা বানিয়ে ছাড়লেন, কিন্তু আসলে হলটা কী?'

'কেন, যা চেয়েছিলেন তাই তো হল। রহস্যের মীমাংসা!' বলে পরাশর সিটটা পেছনে হেলিয়ে আলসাভরে গা এলিয়ে দিল।

'রহস্যের মীমাংসা!' এক ভদ্রলোক একেবারে খাপ্পা—'কোন রহস্যের মীমাংসা হল শুনি? কোথায় গেলেন সেই রামজীবনজি?'

সকলের মুখের ওপর একবার কৌতুকভরে চোখ বুলিয়ে পরাশর গম্ভীরভাবে বললে, 'তিনি আর ইহজগতে নেই।'

'তার মানে?' চমকে উঠে বললাম, 'আর তুমি অম্লান বদনে বলে দিলে ওই বাথরুমের রক্তমাখা জামাকাপড় কিছু নয়।'

'হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কী বলব। কারণ ও জামাকাপড় তাঁর খোলস মাত্র, আর ওই রক্তটা শুধু লাল কালি!' পরাশর এবার হেসেই বললে, 'তিনি ওই জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য বেশে চোরাই সোনা চালানের একজন চাঁই হিসেবে এখন কানপুরের রেল পুলিশের হেফাজতে আছেন। এখন তাঁর নাম আর রামজীবনজি নিশ্চয়ই নেই।'

সমস্ত কামরা একেবারে নিস্তব্ধ। বেশ কয়েক সেকেন্ড বাদে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি আগে থাকতে জেনেই তা হলে কানপুরের পুলিশকে টেলিগ্রাম করেছিলেন। আপনি লোকটাকে চিনতেন?'

'না, সে সৌভাগ্য কখনও হয়নি। মহাপুরুষকে তাঁর হাতের বইটাই চিনিয়ে দিয়েছে।'

'সে আবার কী! ও বই তো ট্রেনের অনেকের হাতেই আছে।'

'হ্যাঁ, আছে এবং তাঁরা ও বই সত্যিই পড়ছেন। কিন্তু আমাদের ভূতপূর্ব রামজীবনজি সারাক্ষণ বইয়ের একটি পাতাও যে ওলটাননি তা আমি ট্রেনে ওঠার পর থেকেই লক্ষ করেছি।'

'তা হলে ও বই কিনে হাতে রাখার মানে?'

'মানে অনেক। প্রথমত যে বই অনেকের হাতেই আছে তা কারও কোনও সন্দেহ জাগাবে না। দ্বিতীয়ত বইয়ের মলাট।'

অবাক হয়ে আমিই প্রশ্ন করলাম, 'ওই অশ্লীল ছবির কথা বলছ?'

'না, অশ্লীল ছবিটা আর-একটা ধোঁকা মাত্র। মলাটের আসল দাম বই পড়বার ছলে তা সারাক্ষণ সকলের চোখের ওপরই হাতে ধরে রাখা যায় বলে। অত্যন্ত দামি গোপন জিনিস

লুকিয়ে রাখার পক্ষে সবচেয়ে ভাল উপায় সকলের সামনে তা ধরে রাখা। আর তার পক্ষে বইয়ের মলাটের মতো সুবিধার জিনিস কমই আছে।"

'কিন্তু বইয়ের মলাটে কী এমন দামি গোপন জিনিস রাখা যায়?'

'রাখা যায় এক টুকরো কাগজ—যার মধ্যে চোরাই সোনা কোথায় কী মজুত আছে তার হদিস সংকেত-চিহ্নে লেখা। চায়ের টেবিলে বসে বইটা একবার কেড়ে নিয়ে তার মলাটটা যে ওই কারণেই ছেঁড়া তা আমি দেখে নিয়েছিলাম।'

পরাশরের এ কথাগুলো কিন্তু সহজে মানতে পারলাম না। বললাম, 'ওই সংকেত-লেখা কাগজের টুকরো বুঝি পকেটে বা যেখানে সেখানে রাখা যায় না?'

'যায়, কিন্তু প্রথমত হাতছাড়া হবার, দ্বিতীয়ত হঠাৎ কোনও কারণে ধরা পড়লে তা পুলিশের হাতে যাবার ভয় থাকে। বইয়ের মলাটে থাকা তাই সবচেয়ে নিরাপদ। মানুষটা যদি ধরাও পড়ে চোরাই মালের গোপন খবর তবু লুকোনোই থাকবে। আমাদের রামজীবনজি ভাবতেই পারেননি যে তাঁর বইয়ের মলাট দুটোই আমি ছিঁড়ে রাখব।'

'তাঁর বই! তাঁর বই তুমি পেলে কোথায়? তুমি তো আলিগড়ে নেমে নিজেই একটা বই কিনে এনেছিলে।'

'হ্যাঁ, সেখান থেকে কানপুরে টেলিগ্রামও করেছিলাম, বইটাও কিনেছিলাম রামজীবনজির সঙ্গে বদল করবার জন্যে। ডিনার খেতে গিয়ে তাঁর গায়ে গরম সুপ ফেলবার ব্যবস্থা করে ওই গোলমালের মধ্যে বইটা বদল করে নিই। রামজীবনজি অতি ধূর্ত লোক। খানিক বাদেই ব্যাপারটা সন্দেহ করে আউট-অফ অর্ডার টাঙানো বাথরুমে গিয়ে বইটার মলাট ছিঁড়ে পরীক্ষা করে দেখেন। হয়তো ব্যাপারটা ভুলই হয়েছে মনে করে আমার কাছে এসে বই চুরি হওয়ার মিথ্যে গল্প বানিয়ে নিজের বইটা আদায় করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমি মলাট ছেঁড়া বইটা দিতেই বুঝতে পারেন তাঁর স্বরূপ আমার কাছে সম্ভবত ফাঁস হয়ে গেছে। তখন পালানো ছাড়া আর অন্য উপায় নেই। টুণ্ডলা স্টেশনের পর বাতি নিবে গেলে আমায় চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে দেখে নিজের ব্যাগটি নিয়ে গিয়ে ওই বাথরুমে জামাকাপড় বদলে ফেলে কানপুরে নামবার জন্যে তৈরি হয়ে থাকেন। কানপুরে পুলিশ আমার টেলিগ্রামে তাঁর চেহারার বর্ণনা পর্যন্ত পেয়ে তার জন্যে যে তৈরি হয়ে আছে তা আর তিনি কী করে জানবেন। জানলে ফাউন্টেন পেনের লাল কালি জামাকাপড়ে ঢেলে বুদ্ধির ওই বাজে খরচ নিশ্চয় করতেন না।'

ঘরে কারও মুখে এবার আর কোনও কথা নেই। আমাদের কামরারই এক ভদ্রলোক শুধু প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, তা হলে অ্যাটাচি বদল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কী?'

'সেটা অতিবুদ্ধির একটা প্যাঁচ। ওঁর নিজের অ্যাটাচিটাই বদল হয়ে গেছে বলে আমাদের দেখিয়ে—গোড়াতে আমাদের একটু গুলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাইতেই ধরা পড়ে গেলেন আরও। ওই অতিবুদ্ধির অহংকারই হল এসব লোকের কাল। প্রথম চা খেতে গিয়ে নিজের গোয়েন্দাগিরি নিয়ে বাহাদুরি আমি ইচ্ছে করেই করেছিলাম। তখনও সন্দেহটা আমার অস্পষ্টই ছিল। অতিবুদ্ধির অহংকারে আসল অপরাধী নিজেকে একটু ধরা দেবেই—আমি এই আশাই করেছিলাম। সে আশা আমার ফলেছে।'

প্রকাণ্ড এক হাই তুলে পরাশর তারপর বললে, 'কিন্তু রাত তো ভোর হতে চলল, এবার একটু ঘুমোলে হয় না?'

তার কথার জবাবেই যেন কামরার জোরালো বাতি আবার নিবে গিয়ে মিটমিটে সবুজ হয়ে গেল।

বই নং
তারিখ

চেঞ্জে গেলেন পরাশর বর্মা

'চমৎকার জায়গা। নদী পাহাড় শালবন। চলে এসো এখুনি।'

পোস্টকার্ডে ওই ক-টি কথা আর তার নীচে সই—পরাশর।

পরাশর ছাড়া এরকম অনুরোধ আর এমন অদ্ভুত চিঠি কে লিখতে পারে!

চমৎকার জায়গা হলেই যেন হল, আমার কাজকর্ম নেই, পয়সাকড়ির ভাবনা নেই। 'এসো' বললেই আমি যেন চলে যেতে পারি।

আর যাব কোথায়? পোস্টকার্ডে কোনও ঠিকানা নেই।

ঠাট্টা যদি হয়, তা হলে এরকম ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না।

কিন্তু ঠাট্টা নয়।

দু-দিন বাদে খামে চিঠি আসতেই তা বুঝলাম।

এবার চিঠিতে সবকিছু খুলে লেখা আছে। মাসখানেকের জন্য একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে পরাশর সিংভূম জেলার একটি ছোট শহরে গিয়ে উঠেছে।

শহর নামেই। স্টেশনকে ঘিরে একটা বাজারেই শেষ, তারপর শুধু মাঠ আর বন, পাহাড় আর নদী। কোনও এক চোরা কোম্পানি যুদ্ধের আর বাংলা বিভাগের পর লোভ দেখিয়ে সেখানে জমি বিক্রি করে বহু বিশ্বাসী নির্বোধ মানুষকে ঠকিয়েছিল। এখন আধা জঙ্গলের মধ্যে এখানে-সেখানে ক-টা বাড়ি উঠেছে। তার কোনওটায় মানুষজন থাকে, কোনওটা দরজা-জানলা বিহনে খাঁ খাঁ করছে।

এ সব পরে গিয়ে দেখলাম। চিঠিতে শুধু প্রকৃতি-বর্ণনাই ছিল, ছিল নির্জনতার স্তব আর নিস্তব্ধতা নিয়ে কবিতা।

সবচেয়ে যেটা দরকার, সেই ঠিকানাও দেওয়া ছিল। স্টেশনের নাম, কোন ট্রেনে গিয়ে কখন নেমে কোথায় কোন রাস্তায় পৌঁছোতে হবে, তার বর্ণনা পর্যন্ত।

পরাশরের অন্যায় আবদারে মনে মনে গজরেও একদিন সত্যিই সেই স্টেশনে গিয়ে নামলাম।

দুপুরবেলা। শীতকাল বলে রোদের ঝাঁজ নেই। অন্য কোনও বাহন, এমনকী সাইকেল-রিকশা পর্যন্ত না থাকায় গোরুরগাড়িতে টিকোতে টিকোতে যেতে যেতে মন্দ লাগল না জায়গাটা।

মধুপুর দেওঘর রাঁচি হাজারিবাগ মানুষের ভিড়ে সত্যিই পচে গেছে। এখনও এমন জায়গা যে আছে দেখেও আনন্দ হল।

পৌঁছোলাম প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে।

কোথায় পৌঁছোলাম, তাই প্রথম বুঝতে পারলাম না। এ তো শুধু জঙ্গল!

না, কিছু দূরে ছাড়া-ছাড়া গোটা তিনেক বাড়ি দেখা যাচ্ছে বটে। কিন্তু গাড়ি তা হলে বাড়ির কাছে পর্যন্ত না গিয়ে এখানে থামল কেন?

গাড়োয়ানকে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম।

সে হেসে বললে, 'না বাবু, ও বাড়িতে যাবো নাই। ও বাড়িতে পাগলাবাবু তাইলে ছবি খিঁচে লিবেক।'

একটু কষ্ট করে বুঝলাম, ফটো তোলার কথা বলছে গাড়োয়ান।

হেসে বললাম, 'তা ফটো নিলে দোষ কী। ভালই তো!'

গাড়োয়ান যা বলল তাতে বুঝলাম, ফটো তোলার যত আকর্ষণই থাক, তাদের বর্ণিত পাগলাবাবু বাড়াবাড়ি করে ব্যাপারটা এদের কাছেও পচিয়ে দিয়েছে। একবার তার হাতে পড়লে ঘণ্টাখানেকের আগে নাকি ছুটি নেই। মানুষটা থেকে শুরু করে গাড়ি গোরু মায় আলাদা চাকাগুলোর পর্যন্ত বার বার ফটো তুলে তবে ছাড়বে। আর তাও সে কি একবারের পালাতেই শেষ! দেখা একবার পেলেই হল। আগে ফটো তোলা হয়েছে বললেও নিস্তার নেই।

পাগলাবাবুটি যে কে, তখুনি খানিকটা অনুমান করে ফেলেছিলাম। গাড়োয়ানকে অনেক আশ্বাস দিয়ে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে দেখলাম অনুমান আমার নির্ভুল।

পাগলাবাবু আর কেউ নয়, আমাদের পরাশর।

গাড়োয়ানকে যে আশ্বাস দিয়েছিলাম, তা রক্ষা করতে পারলাম না পুরোপুরি। আমায় সাদর সম্ভাষণ জানাবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়োয়ানের দুটো ছবি না নিয়ে সে ছাড়লে না। সেই সঙ্গে আমারও ওই অবস্থায় গোটাতিনেক বিভিন্ন পোজ-এ। ট্রেনের ধকলের পর মুখ-হাত-পা পর্যন্ত না ধুয়ে দু-দণ্ড না জিরিয়ে এই ছবি নেওয়ার জন্য মডেল হওয়া কী মধুর যে লাগল তা বোধহয় বলবার দরকার নেই।

দু-দিন পরাশরের সঙ্গে কাটাবার পর তার নতুন নেশায় প্রায় পাগল হয়ে উঠলাম।

এর চেয়ে বুঝি কবিতার নেশা ভাল ছিল।

এই জনমানবহীন জঙ্গলে এসেও তার ফটো তোলার বাতিক এমন চাগিয়ে উঠেছে জানলে কে এখানে আসত!

দিন-রাত ফটো তোলা নিয়েই আছে। হয় যেখানে-সেখানে ছবি তুলছে, নয় বাড়ির যে ঘরটা ডার্করুম বানিয়েছে তারই ভেতর আছে সেঁধিয়ে।

বাইরে কোথাও বেরোলে তো একটা নয়, সঙ্গে একেবারে দু-দুটো ক্যামেরা। মানুষজন থেকে গাছ-পাথর সবকিছু সেই ক্যামেরায় ধরা চাই।

এই মাত্রাছাড়া বাতিকের দরুন এই নির্জন দেশেও পাগলাবাবু বলে তার খ্যাতি যে বেশ ছড়িয়েছে, ক-দিন তার সঙ্গে একটু-আধটু বেরিয়েই ভাল করে টের পেলাম।

রাখালটাখাল চাষিটাষি এখনও অবশ্য ফটো তুলতে দিতে আপত্তি সবাই করে না। কিন্তু দূর থেকে দেখেই সরে পড়ার দৃষ্টান্তও বহু চোখে পড়ল। আর পিছনে শুধু নয়, সামনেই যে তারা হাসে, সে তো পরাশর নিজের চোখেই দেখতে পায়।

কিন্তু পরাশরের তাতে লজ্জা নেই।

এই ফটোর বাতিক থেকে একটা অমন উপকার হবে তা অবশ্য তখন ভাবতে পারিনি।

আমাদের কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে আর দুটি মাত্র বাড়ি। তার একটি লোকজনের অভাবে তালাবন্ধ। আর একটিতে এক বৃদ্ধ দম্পতি থাকেন।

প্রতিবেশী হিসেবে তাঁদের সঙ্গে সামান্য পরিচয় হয়েছে। পরাশরের কাছে একটু আভাস পাবার পর তাঁদের জীবনের একটা অত্যন্ত করুণ ব্যাপারের কথা আগেও কিছু শুনেছি বলে মনে পড়েছে।

তাঁদের একটি মাত্র মেয়ে শুভা আজ বছর দুই হল নিরুদ্দেশ। পয়সার অভাব নেই বলে তাঁরা খোঁজবার কোনও ত্রুটি করেননি। কিন্তু তাঁদের অকাতর অর্থব্যয় আর ভারতবর্ষময় পুলিশের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও শুভার কোনও হদিসই মেলেনি। বড়লোকের খেয়ালি মেয়ে। বাড়িতে থাকতে ছায়াছবিতে অভিনয় করবার জন্য একবার নাকি অত্যন্ত জেদ ধরেছিল। বাপ-মা তাতে বাধাই দিয়েছিলেন তখন মেয়ের ভালোর জন্য, কিন্তু এখন তাঁদের সেজন্য আফসোসের সীমা

নেই। ফিল্মে গিয়ে অভিনয় করতে অনুমতি দিলে এমন করে আজ তাকে হারিয়ে তো জীবন্মৃত হয়ে থাকতে হত না। তাঁদেরই আত্মীয় স্থানীয় যে ছেলেটি তখন তাঁদের বাড়িতে আসত যেত, এবং শুভাকে সিনেমায় ঢুকিয়ে দেবার আশা দিয়ে যে তার মনে ওই জেদ ধরিয়েছিল বলে বিশ্বাস, আশ্চর্যের বিষয় মেয়েটি নিরুদ্দেশ হবার কিছু পরে তারও আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

বুড়ো-বুড়ির ওই মেয়েটিই ছিল চক্ষের মণি। তাকে হারিয়ে বাড়িতে টিকতে না পেরে তাঁরা মনের অস্থিরতায় তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু ভাগ্য তাঁদের ওপর সত্যি নিষ্ঠুর। ত্রিচিনাপলিতে আরও বহু যাত্রীর সঙ্গে যে নৌকোয় তাঁরা কাবেরী পার হয়ে তাঞ্জোরের মন্দির দেখতে যাচ্ছিলেন, সে নৌকো ডুবে গিয়ে যাত্রীদের অধিকাংশই মারা যায়। কিন্তু মরলে যাদের হাড় জুড়োয়, অনেক শাস্তি এখনও বাকি বলেই, তাঁরাই আশ্চর্যভাবে আর কয়েকজনের সঙ্গে রক্ষা পান।

তীর্থ থেকে ফিরে নিজেদের বাড়িতে বাস করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়েছে। বছর খানেক হল এই নির্জন জায়গার বাড়িটিতে তাই জীবনের শেষ ক-টা দিন তাঁরা স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়ে আছেন।

বুড়ো-বুড়ির সঙ্গে প্রথম যেদিন পরাশর দেখা করতে নিয়ে যায় সেদিনই প্রসঙ্গক্রমে বৃদ্ধের ওই নৌকাডুবির কথা বলতে গিয়ে গলাটা ধরে গিয়েছিল। 'কী পাপ করেছি আর-জন্মে জানি না, নইলে আমাদের মতো বুড়ো-বুড়িকে অমন সুযোগ পেয়েও যম পায়ে ঠেলে যায়!'

'অত হতাশ হবেন না, সাধনবাবু! ভাগ্য মিছিমিছি হয়তো আপনাদের বাঁচায়নি, হয়তো আবার মেয়েকে ফিরিয়ে দেবে বলেই এই পরমায়ুটুকু দিয়েছে।'

সাধনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস চেপেছেন। বৃদ্ধার চোখের অসুখের জন্য ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ। কিন্তু আধো-অন্ধকার ঘরেও বৃদ্ধার চোখটা যেন ছলছল করে উঠেছে টের পেয়েছি।

সাধনবাবু একটু তবু খাড়া আছেন, বৃদ্ধা কিন্তু একেবারে ভেঙে পড়েছেন। শোকের সমুদ্র পার হয়ে এখন কেমন একটু জড়ভরত গোছের অবস্থা। ঘর থেকে বারই হন না, নেহাত পরাশরের কথায় একটু আশার আলো পান বলেই বোধহয় তার পেড়াপীড়ি ঠেলতে না পেরে মাঝে মাঝে একটু বাইরে এসে বসেন। তাও পাঁচটা কথায় একটা উত্তর কোনওরকমে দেন মাত্র। মুখে সারাক্ষণই কেমন একটা নির্বোধের মতো অসহায় হাসি লেগে আছে। সেটা আরও করুণ। যেন সমস্ত চোখের জল শুকিয়ে গিয়ে মরা নদীর বালি আর নুড়িগুলো বেরিয়ে আছে।

পরাশরের বুঝি মরা মানুষের মধ্যেও সাড় ফেরাবার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। নানারকম মজার কথা বলে, মেয়েকে ফিরে পাবার নানাভাবে আশ্বাস দিয়ে সে মাঝে মাঝে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য অন্তত তাঁদের কতকটা চাঙ্গা করে তোলে।

তার সে ফটো তোলার বাতিক থেকে অবশ্য এঁদেরও রেহাই নেই।

বাড়িটার বাইরে থেকে ভেতরে থেকে অন্তত সে দশবার ছবি তুলেছে। যে ঘরটায় আমরা সাধারণত গিয়ে বসি, সেই ঘরটার ছবিই একদিন তোলার বায়না ধরলে। এত দুঃখের মধ্যেও ফোক্‌লা মুখে একটু হেসে সাধনবাবু বললেন, 'দাঁড়ান, জানলাগুলো তা হলে খুলে দিই। এ ঘরে কীই বা আছে আর অন্ধকারে তুলবেনই বা কী!'

'আপনাকে কিছু করতে হবে না। এই অন্ধকারেই শুধু ঘরটা আমি তুলতে চাই। আর আমি তো আপনাদের কি ঘরের আসবাবের ছবি নিচ্ছি না। এ ঘরে কী একটা থমথমে আবহাওয়া যেন আছে। সেইটে আমি শুধু ক্যামেরায় ধরতে পারি কি না দেখি। আপনারা পেছনে দাঁড়িয়ে দেখুন-না।'

তার পাগলামিতে বাধ্য হয়ে আমাদের সকলকে পেছনে দাঁড়াতে হয়েছে। আধো-অন্ধকার ফাঁকা ঘরটার কী আবহাওয়া সে তুলতে চেয়েছে সে-ই জানে। কিন্তু সে আশাও তার পূর্ণ হয়নি।

ফ্ল্যাশ বাতি জ্বলতে না জ্বলতে ক্যামেরা নিয়ে পিছু হটবার সময় একটা চেয়ারে ঠেকে পড়ে গিয়ে সব পণ্ড হয়ে গেছে।

বৃদ্ধাকে আমিই হাতে ধরে তার পর তাঁর ভেতরের ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসেছি। মেয়ের জন্য কেঁদে কেঁদেই তাঁর চোখ প্রায় খারাপ হয়ে গেছে জানতাম। সাধারণ আলোই তাঁর চোখে সহ্য হয় না। ফ্ল্যাশ বাতির চোখ ধাঁধানো আলোয় প্রায় অন্ধই হয়ে গেছেন কিছুক্ষণের জন্য।

ততক্ষণে পরাশর আর একবার ফ্ল্যাশ বাতি জ্বেলে ফাঁকা ঘরের ছবি নিয়েছে।

নিজেদের বাড়িতে ফেরবার পথে পরাশরকে আমি একটু বকুনি না দিয়ে পারিনি।

'তোমার বিদ্‌ঘুটে শখটা এই বুড়ো-বুড়ির ওপরও না খাটালে নয়।'

পরাশর একটু লজ্জিত হয়ে বলেছে, 'কিন্তু আমি ওঁদের একটু খুশি রাখবার জন্যেই তো এসব করি। এমন জ্যান্ত কবরে থাকা কি ভাল?'

'কিন্তু আঙুলে জলের ছিটে দিয়ে ঘর-পোড়ানো আগুন তুমি কতটুকু নেভাবে? আর তা ছাড়া মেয়ে ফিরে পাওয়ার আশা যে তুমি দাও, সেটা একদিক দিয়ে অন্যায় নয়? আশা দেবার মতো সত্যি কি তুমি কিছু খবর পেয়েছ?'

'না, এখনও পাইনি!' পরাশর বেশ একটু কুণ্ঠিতভাবে বলেছে, 'কিন্তু আমার কেমন মনে হয়, সে মেয়ের খোঁজ পাওয়া যাবেই।'

এবার আমার নিজের অদ্ভুত অনুভূতির কথাটা আমি না জানিয়ে পারিনি। বলেছি, 'দেখো, এইসব গোলমালে এখন গুলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তোমার এই ছবি নেওয়ার কেলেঙ্কারির আগে বা পরে এখন মনে করতে পারছি না, কী যেন একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছি।'

পরাশর উদ্‌গ্রীব হয়ে আমায় মনে করাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ফল কিছু হয়নি।

পরাশরের ফটো তোলার নেশা থেকে, যত সামান্যই হোক, একটা হদিস কিন্তু আশ্চর্যভাবে একদিন পাওয়া গেছে।

অ্যালবামটা নিয়ে গিয়ে পরাশর সেদিন সাধনবাবুকে তাঁর বাড়ির ছবিগুলো দেখাচ্ছিল। পাতা ওলটাতে গিয়ে হঠাৎ একটি পাতায় একটা ছবি দেখে সাধনবাবু যেন চমকে উঠেছেন। ছবিটা একটি মেয়ের।

ব্যাপারটা আমারও নজর এড়ায়নি। পরাশর একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, 'কী ব্যাপার, সাধনবাবু! মেয়েটি চেনা মনে হচ্ছে নাকি?'

সাধনবাবু প্রথমটা কিছু বলতেই চাননি। তারপর দু তিনবার অনুরোধ করায় দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলেছেন, 'হ্যাঁ, কতকটা শুভার মতোই দেখতে।'

'শুভা! আপনার সেই হারানো মেয়ে!' পরাশর উত্তেজিতভাবে বলেছে, 'কিন্তু তাকে তো আমি কখনও দেখিনি! তা হলে এ ছবি আমি তুললাম কোথায়? দাঁড়ান, দাঁড়ান।'

পরাশর মনে করবার চেষ্টা করেছে আর আমরা উদ্‌গ্রীবভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছি।

'ঠিক!' খানিক বাদে পরাশর সোৎসাহে বলেছে, 'এ ছবি তো আমি কিছুদিন আগে এখানকার স্টেশনে তুলেছি মনে হচ্ছে। এক জায়গায় কয়েকজন দাঁড়িয়েছিলেন। মেয়েটির মুখে কী যেন একটা আছে মনে হওয়ায় না জানিয়ে তুলে নিয়েছি। কিন্তু তা হলে—'

সাধনবাবুই বাধা দিয়ে হতাশভাবে বলেছেন, 'না, তা হতে পারে না পরাশরবাবু। সে যদি বেঁচেও থাকে, তা হলেও ঠিক এইখানে তাকে আপনি দেখেছেন, এ কি সম্ভব হতে পারে? এ নিশ্চয় তারই মতো আর কারও ছবি আমায় যন্ত্রণা দিতেই ভাগ্য আপনার হাত দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছে!'

কথাটা আমাদেরও ঠিক বলে মনে হয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে সাধনবাবু বলেছেন, 'আর যাই হোক আমার স্ত্রীকে এ ছবি কখনও দেখাবেন না বা কিছু বলবেন না। মিছিমিছি বড় দুঃখ তা হলে পাবেন।'

বেশ একটু বিষণ্ণ মন নিয়েই সেদিন বাড়ি ফিরেছি।

তার পরের দিন দুপুর থেকেই পরাশর হঠাৎ উধাও। দুপুরে খেয়েদেয়ে ক্যামেরা নিয়ে সেই যে সে বেরিয়েছে আর তার দেখা নেই।

সারারাত অত্যন্ত উদ্‌বেগে কাটিয়ে সকালে স্থানীয় থানায় খবর দিতে যাব কি না ভাবছি, এমন সময় উসকো খুসকো চেহারা নিয়ে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে সে একটা জিপ গাড়িতে এসে হাজির।

'চলো, চলো, এখুনি সাধনবাবুর বাড়ি যেতে হবে।।'

অবাক হয়ে বললাম, 'সেকী! কেন? সারারাত কোথায় ছিলে, কী ব্যাপার সেটা আগে শুনি!'

'সব পরে শুনবে। এখন আর দেরি করবার সময় নেই। সেই শুভাকে পাওয়া গেছে।'

'শুভাকে পাওয়া গেছে!' নিজের কানকেই আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না।

বিশ্বাস সাধনবাবুও প্রথম কিছুতেই করতে চান না।

'কেন বৃদ্ধকে মিছিমিছি পরিহাস করছেন, পরাশরবাবু! সমস্ত ভারতবর্ষ পুলিশ দিয়ে খুঁজিয়ে যাকে পাইনি তাকে আপনি এখানেই পেয়েছেন, এ কথা বিশ্বাস করতে বলেন!'

'বিশ্বাস তো এখন করতে বলছি না, চাক্ষুষ দেখেই করবেন চলুন-না। আপনার কষ্ট হবে বলে জিপটা চেয়ে এনেছি। এখান থেকে থানা তো আধঘন্টার পথও নয়।'

সাধনবাবু শেষবার একটু মৃদু আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'কিন্তু সত্যিই যদি পেয়ে থাকেন, তা হলে থানায় না নিয়ে গিয়ে এখানে আনতে পারতেন না!'

'তার কারণ আছে সাধনবাবু। ওখানে গেলেই বুঝতে পারবেন।'

জিপে উঠে থানায় যাবার পর দারোগা সাহেব অত্যন্ত খাতির করেই ভেতরের একটি ঘরে আমাদের বসালেন।

pathagar.net

সাধনবাবুর মতো আমারও তখন মেয়েটিকে দেখবার ব্যাকুলতাই প্রধান।

সাধনবাবু সেই কথাই সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করলেন, 'কই, শুভাকে তো দেখছি না।'

'দেখবেন, এখুনি দেখতে পাবেন। একটু ধৈর্য ধরুন।'

ধৈর্য প্রায় আধ ঘন্টার ওপরই অবশ্য ধরতে হল।

তার পর ছোট দারোগা ও দু-জন কনেস্টবলের সঙ্গে যে ঘরে ঢুকল তাকে দেখে সত্যিই আমি স্তম্ভিত।

ছবিতে যে চেহারা দেখেছি অবিকল সেই তরুণী মেয়েটি। শুধু মুখটা রাগে ও বিরক্তিতে অত্যন্ত কঠিন।

'শুভা!' সাধনবাবু তার দিকে চেয়ে ভাবাবেশে আর কিছুই বলতে পারলেন না। তাঁর মুখের চেহারা দেখলে ভেতরে তাঁর যে কী হচ্ছে তা বোঝা কঠিন।

'কী, সাধনবাবু!' পরাশর হেসে বললে, 'চাক্ষুষ দেখে সন্দেহভঞ্জন হয়েছে নিশ্চয়। কেমন, ইনিই তো সেই হারানো শুভা?'

সাধনবাবু কোনও উত্তর দিতে পারলেন না। শুধু মাথা নাড়লেন।

পরাশর আবার বললে, 'অবশ্য ইনি আপনার মেয়ে নন—যেমন আপনিও সাধনবাবু নয়।'

ঘরের ভেতর একটা বোমা ফাটলেও অত চমকে উঠতাম না বোধহয়।

'সাধনবাবু নয়!' মুখ দিয়ে আপনা থেকে বেরিয়ে গেল।

'না, ইনি হবু-অভিনেতা কমলাক্ষ রায়, শুভাকে ফিল্মে নামাবার আশা দিয়ে ভুলিয়ে যিনি তাকে নিয়ে পালিয়েছিলেন। মেক-আপটা এবার তা হলে ওদিকের বাথরুমে গিয়ে তুলে আসুন কমলাক্ষবাবু। ছদ্মবেশ ধরে যা অভিনয় দু-জনে এতদিন করেছেন তা সিনেমার বাঘা বাঘা অভিনেতা করতে পারত কি না সন্দেহ।'

সাধন বা কমলাক্ষ যেই হন, টেবিলের ওপর ভর দেওয়া দুটো হাতের মধ্যে তিনি এবার মুখ গুঁজলেন।

শুভারই জ্বলন্ত কণ্ঠস্বর এবার শোনা গেল, 'ছদ্মবেশ, অভিনয় যাই আমরা করে থাকি, নিজের বাড়িতে করেছি। আপনাদের তাতে কী! কারও কোনও ক্ষতি তো আমরা করিনি। তবে আমাদের এভাবে ধরে এনে অপমান করবার কী অধিকার আপনাদের আছে? আমায় মিথ্যে করে গিয়ে বলেছে যে উনি থানায় সমস্ত কথা স্বীকার করে ধরা দিয়েছেন। এ মিথ্যে কথা কেন আমায় বলা হয়েছে?'

'সত্যকে টেনে তোলবার জন্যেই মিথ্যে টোপ কখনও-কখনও ফেলতে হয়, শুভা দেবী!' পরাশর একটু হেসে বললে, 'ওই কথা না বললে কি আপনি এখানে আসতেন!'

'কিন্তু আমায় এখানে আনবার দরকার কী আপনাদের! কোন অধিকারে এনেছেন আবার জিজ্ঞাসা করছি।'

'নাম ও সই জাল করে পরলোকগত সাধন সমাদ্দার মশাইয়ের বিষয় সম্পত্তির আয় ভোগ করার অভিযোগেই আনা হয়েছে মনে করুন!' দারোগা সাহেব নিজেই এবার মন্তব্য করলেন।

শুভা দেবীর স্বর আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, 'কিন্তু সে সম্পত্তিও তো আমার নিজের। আমিই বাবার একমাত্র মেয়ে ও উত্তরাধিকারিণী।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক—কিন্তু উত্তরাধিকার তো এখনও পাননি। এখনও আইনের চোখে আপনি নাবালিকা। শুধু তাই নয়, আপনার বাবার উইলে লেখা আছে যে, যাঁকে তিনি আপনার অভিভাবক করে যাচ্ছেন, সেই গুণময় মান্না মশাইয়ের মতের বিরুদ্ধে আপনি বিবাহাদি কিছু করলে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন। তাই এই কমলাক্ষের পরামর্শে, আপনি এক ঢিলে দুই পাখি মারবার ব্যবস্থা করেছেন। ভাগ্যও আপনাদের সাহায্য করেছে। আপনার বাবা ও মা সত্যিই সেই সুদূর দাক্ষিণাত্যে কাবেরী নদীতে ডুবে মারা যান। আপনারা তখন ধরা পড়বার ভয়ে নানা জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কাগজে সে সংবাদ পাবার পরই এই ফন্দি আপনাদের মাথায় আসে। বুড়ো-বুড়ি সেজে ত্রিচিনাপলিতে গিয়ে আপনারা যেন ডোবা নৌকো থেকে কোনওরকমে রক্ষা পেয়েছেন এই কথা সকলকে জানান। সেখানে বাঙালি নেই বললেই হয়। আপনাদের কথায় সন্দেহ করবার কোনও কারণও কারও ছিল না। সেখান থেকে গুণময়বাবুকে টেলিগ্রামে সাধনবাবুই যেন তাঁর রক্ষা পাওয়ার কাহিনী জানিয়ে টাকা চেয়ে পাঠান। গুণময়বাবু সরল বিশ্বাসে সে টাকা পাঠিয়েছেন। আপনারা ইতিমধ্যে হঠাৎ একবার কলকাতার বাড়িতে ক-দিনের জন্যে এসে গুণময়বাবুর সঙ্গে দেখা না করেই আবার এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এসে আস্তানা গাড়েন। এখান থেকে মাঝে মাঝে গুণময়বাবুর কাছে টাকার জন্যে টেলিগ্রাম যায়। গুণময়বাবু বৃদ্ধ লোক, এতদূর নিজে থেকে এসে দেখা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব না হলেও সহজ নয়। তা ছাড়া কোনও কিছু সন্দেহ করার কথা তাঁর মাথাতেও আসেনি। তিনি শুধু সাধনবাবুর হয়েই তাঁর হারানো মেয়ের সন্ধান করছেন। অন্য সব চেষ্টায় বিফল হয়ে আমাকে সেই জন্যেই তিনি ডাকিয়ে গোপনে এ ব্যাপারের ভার দেন। তাঁর কাছে সমস্ত শুনে আমিও প্রথমে কিছু সন্দেহ করিনি। শুধু সোজাসুজি বুড়ো-বুড়ির কাছে না গিয়ে কাছাকাছি থেকে তাঁদের সঙ্গে ভাব করে তাঁদের মেয়ে সম্বন্ধে কিছু খবর সংগ্রহ করতে আমি এখানে এসে বাড়ি নিয়েছিলাম। আমিও হয়তো কিছুই না বুঝে এখান থেকে চলে যেতাম যদি না—'

'যদি না, কী?' শুভার সঙ্গে আমিও প্রশ্ন করে উঠলাম।

'যদি না লক্ষ করতাম যে অন্ধকার ঘরে ছাড়া সাধনবাবুর স্ত্রীরূপী বৃদ্ধা মহিলাকে কখনও বাইরের লোক দেখতে পায় না। তার পর কারও সন্দেহ না জাগিয়ে যা ব্যবহার করবার জন্যে এ অঞ্চলে পাগলাবাবু বদনাম পর্যন্ত ইচ্ছে করে কিনেছি আমার সেই ক্যামেরাই অবশ্য আমাকে সাহায্য করেছে।' পকেট থেকে একটা ফটো বার করে সকলের সামনে ধরে পরাশর শুভাকেই

বললে, 'মেক-আপটা সেদিন একটু তাড়াতাড়ি করেছিলেন শুভা দেবী! ক্যামেরার লেন্সকে তাই ফ্ল্যাশ লাইট-এ ফাঁকি দিতে পারেননি!'

'আপনি—' কথাটা শুভার মুখে আটকে গেল।

'হ্যাঁ, শুভা দেবী, সেদিন ক্যামেরাটা নিয়ে সত্যি পড়ে যাইনি। পড়ে যাবার ভান করে ফ্ল্যাশ লাইট-এ আপনার ফটোটাই নিয়েছিলাম। তারপর গুণময়বাবুর কাছেই পাওয়া ছবি সমেত অ্যালবাম দেখাবার ভান করে সাধনবাবু—থুড়ি—কমলাক্ষবাবুকে আর একবার পরীক্ষা করে নিয়ে আপনাদের অভিনয়ে দাঁড়ি টানবার এই ব্যবস্থা করেছি। বড় সময় মতোই কাজটা করতে পেরেছি, কারণ আর ছ-টা মাস বাদেই আপনি সাবালিকা হবেন। তখন আপনাকে পায় কে? আপনারা সেই আশাতেই দিন গুনছিলেন জানি!'

'কিন্তু এখন আমাদের নিয়ে কী করবেন?' কমলাক্ষ এবার প্রশ্ন করল। দেখা গেল দু-জনের মধ্যে সে-ই একটু ভীরু। কে জানে, এই চক্রান্তের মধ্যে নেতৃত্বের ভূমিকা হয়তো তার নয়, শুভার।

পরাশর দারোগাবাবুর দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। তার পর বললেন, 'কী করা হবে তা আমাদের চেয়ে যিনি ভাল জানেন, তাঁকেই ডাকছি। আসুন গুণময়বাবু, আপনার আসামিরা বিচারপ্রার্থী।'

পাশের ঘর থেকে সৌম্য চেহারার যে বৃদ্ধ এবার ঢুকলেন, ভেতরে পা দিয়ে শুভাকে দেখেই তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি ও শুভা দু-জনেই দু-জনের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তার পর শুভা হঠাৎ 'মামাবাবু' বলে তাঁর বুকের ওপর গিয়ে পড়ে সেখানে মাথাটা রাখল। গুণময়বাবু ও শুভা দু-জনের চোখেই তখন জল।

'আমাদের এখন কী করতে হবে বলুন, গুণময়বাবু?' দারোগাবাবুর গলার স্বরটা গম্ভীর হলেও কেমন যেন কৌতুক মেশানো।

pathagar.net

গুণময়বাবু ধরা গলায় বললেন, 'কিছুই নয়। আমাদের শুধু দু-জনকে—না, তিনজনকেই আপনাদের জিপে যদি জংশন স্টেশনের দুপুরের ট্রেনটা একটু ধরিয়ে দেন।'

'তার মানে কমলাক্ষর বিরুদ্ধে আপনি কোনও অভিযোগ আনছেন না? তাঁকেও সঙ্গে নিচ্ছেন।'

গুণময়বাবু অসহায়ভাবে বললেন, 'না নিয়ে কী করি বলুন? যা হয়ে গেছে তা তো আর ফিরবে না। যদি পরলোক থাকে তা হলে শুভা-মাকে যে ফিরে পেয়েছি এতেই বুড়ো-বুড়ির আত্মা তৃপ্তি পাবে।'

বাড়ি ফিরে যেতে-যেতে পরাশরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, তুমি তো এই জন্যেই এখানে এসেছিলে বুঝলাম, কিন্তু আমায় ডাকাবার মানে কী?'

'পাছে সন্দেহ করে আগেই পাখি উড়ে যায়, তাই তোমায় আনিয়ে চেঞ্জে আসাটার স্বাভাবিক চেহারা দিতে চেয়েছিলাম।'

'কিন্তু প্রথম পোস্টকার্ডে ঠিকানা দাওনি কেন?'

'সেটাও তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কতখানি তা পরীক্ষা করতে। পোস্টমার্ক দেখলেই স্টেশনটার নাম তুমি বার করতে পারতে। আর এখানে একবার এলে এই ক-টা মানুষের মধ্যে আমায় যদি খুঁজে না বার করতে পারতে তা হলে লজ্জার কথা।'

একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বললাম, 'গোয়েন্দাগিরি তো আমার শখ বা পেশা নয় যে সবকিছুতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেব। আচ্ছা, আর একটা কথা ভেবে এখনও কেমন গোলমাল লাগছে। তোমায় তখন বলেছিলাম মনে আছে বোধহয় যে, তোমার সেই ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে ছবি তোলার দিন কী যেন আমি একটা দেখেছিলাম। সেটা কী এখনও মনে করতে পারছি না। তুমি কিছু বুঝতে পেরেছ?'

'পেরেছি।' বলে পরাশর হাসলে—'তুমি দেখোনি কিছু, শুধু অনুভব করেছ!'

'অনুভব করেছি!'

'হ্যাঁ, বৃদ্ধারূপী শুভাকে হাত ধরে ঘরে দিয়ে আসবার সময় নিজের অজান্তেই তুমি অনুভব করেছ যে, হাতটা কোনও বৃদ্ধার নয়। বৃদ্ধা আর যুবতীর হাতের স্পর্শ আলাদা হতে বাধ্য। তোমার হাত যেটা টের পেয়েছে, তোমার মন স্পষ্টভাবে সেটা বুঝতে পারেনি। সবচেয়ে বড় প্রমাণটা তুমিই আগে পেয়েছিলে, কিন্তু ধরতে পারোনি।'

প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি বদলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু তুমি কাল দুপুর থেকে সারারাত কী করলে?'

'থানার দারোগাকে সব জানিয়ে কলকাতায় গিয়ে গুণময়বাবুকে নিয়ে এলাম।'

পরাশর বর্মা ও বাঁধানো ছবি

pathagar.net

শুক্রবার কাগজের কাজকর্ম দুপুরেই একরকম শেষ হয়ে যায়। এর পর যা দায় তা ছাপাখানার আর দপ্তরির। শেষ ফর্মাটায়, মানে কাগজের প্রথম ফর্মায় প্রিন্ট-অর্ডার দিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম, আড়াইটা এখনও বাজেনি।

মনে হল অনেকদিন ছবিটবি দেখা হয়নি। গেলে হয়। ছবি দেখার সেরকম বাতিক আমার নেই। কিন্তু কলকাতায় দু-মাস ধরে এমন নাকি এক ছবি চলেছে যা না দেখলে আর মান থাকে না।

চেনা অচেনা যার সঙ্গে দেখা হোক, খানিক আলাপের পর এ ছবির কথা উঠবেই।

'দেখেছেন ছবিটা!' কেউ উচ্ছ্বাসে গদগদ।

'কী যে রুচি হয়েছে আজকাল মানুষের! পয়সা দিয়ে ওই আজগুবি ছবি কেউ দেখে!' যিনি ঘৃণায় নাক সেঁটকান, তিনিও অবশ্য পয়সা দিয়ে ছবিটা না দেখে পারেননি!

অর্থাৎ ভাল লাগুক, বা না লাগুক এ ছবি না দেখলে সভ্যসমাজে নাম কাটা যাবার ভয়।

টেবিলের ড্রয়ারে চাবি দিয়ে তাই ওঠবার উপক্রম করছি, এমন সময় ফোন বেজে উঠল।

ধরব না ভেবে দরজার দিকে দু-পা বাড়িয়েও চলে যেতে শেষ পর্যন্ত বাধল। ফিরে এসে ফোন ধরতেই পরাশরের গলা।

'হ্যালো, কৃত্তিবাস! আছ তা হলে? এখুনি যাচ্ছি। একটা বিশেষ দরকার।'

আমায় কথা বলবার কোনও সুযোগ না দিয়েই পরাশর ওধারে ফোনটা নামাল।

সত্যি কথা বলতে গেলে পরাশরের সঙ্গ লাভের সম্ভাবনায় খুশির চেয়ে সন্ত্রস্তই হয়ে উঠলাম আপাতত। বিশেষ দরকার মানে তিন দিস্তে কবিতা নিশ্চয়। সিনেমায় যাওয়ার তো দফা রফা, তার ওপর পরাশরী কবিতার ধাক্কা সামলাতে ক-টা অ্যাসপিরিন লাগবে কে জানে!

বেশিক্ষণ অবশ্য অপেক্ষা করতে হল না। মিনিট দশেক বাদেই পরাশর এসে হাজির। কিন্তু

আশ্চর্য, তার হাতে কবিতার খাতা নয়, একটা খবরের কাগজ।

আজকাল সে খবরের কাগজেই কবিতা ছাপাচ্ছে নাকি? না, তাও নয়, কাগজের একটা লাল পেনসিলে দাগ দেওয়া বিজ্ঞাপন আমায় দেখিয়ে সে একটা জরুরি ব্যাপার আলোচনা করতে চায়।

কবিতার বদলে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন শুনে তখন আমার মেজাজ খোশ হয়ে সাহস বেড়েছে। খবরের কাগজটা মুড়ে পকেটে রেখে বললাম, 'তোমার সব কথা শুনতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু তার আগে তোমায় সিনেমায় একটা ছবি দেখতে যেতে হবে আমার সঙ্গে।'

'ছবি! কী ছবি?' পরাশর সত্যি হতভম্ব।

'তোমার পছন্দসই ছবি।' তাকে ভরসা দিলাম।

'আমার পছন্দসই? কোনও কবিটবির জীবনী? সেরকম কোনও ছবি কোথাও দেখাচ্ছে নাকি?'

'আরে না, কবির জীবনী হবে কেন? গোয়েন্দাগিরির রহস্য রোমাঞ্চের ছবি।'

পরাশর নাক সিঁটকে বললে, 'না, না, ওসব ছবি আবার মানুষে দেখে!'

'হ্যাঁ, দেখে। কলকাতার অর্ধেক মানুষ দেখেছে। তোমাকেও আজ আমার সঙ্গে যেতে হবে। তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়া অবধি অনেক জুলুম তোমার সয়েছি। আমার এ অনুরোধ তোমায় রাখতেই হবে।'

পরাশর আর আপত্তি করলে না। কিন্তু কুইনিন গেলার মতো যেরকম করে সিনেমা হল-এ গিয়ে বসল, তাতে মনে মনে হাসিই পাচ্ছিল।

কয়েকটা ছোটখাটো সংবাদ চিত্র ইত্যাদির পর একটু বিরতি। তার পর আসল ছবি আরম্ভ। ছবি তিন রিল কি বড় জোর চার রিল চলবার পরই হঠাৎ পাশে চেয়ে দেখি সিট-এ যতখানি সম্ভব হেলান দিয়ে পরাশর পরমানন্দে ঘুমোচ্ছে।

সত্যি একটু রাগই হল। হতে পারে পরাশর মস্ত গোয়েন্দা, তা বলে এরকম একটা পয়লা নম্বরের ছবিতেও তার মন বসে না! আমি তো তখন সত্যি মশগুল হয়ে ছবির গোলকধাঁধায় নাজেহাল হচ্ছি। অত বড় গোয়েন্দাই যখন, তখন এ ছবির আসল শয়তান কে, ধরবার চেষ্টা করুক-না!

কনুয়ের একটা খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তাকে সেই কথাই চাপা গলায় বললাম।

'হুঁ!' বলে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে পরাশর ছবিটায় মনোযোগ দেবারই চেষ্টা করলে বোধহয়। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! খানিক বাদেই আবার যথাপূর্বম।

এবার ঠেলা দিতে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে বলল, 'ছবি শেষ হয়ে গেছে নাকি?'

'ছবি এরই মধ্যে শেষ হবে কী হে! সবে তো অর্ধেক।'

'এখনও অর্ধেক!' হতাশভাবে সে আবার সিট-এ এলিয়ে পড়ে একটা কাগজে কী লিখে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, 'এটা রাখো। আর শেষ হলে আমায় জাগিয়ো।'

'তাই জাগাব!' বিরক্তভাবে বলে তার দেওয়া কাগজটা তাচ্ছিল্যভরে পকেটে রেখে দিলাম।

ছবিটা সত্যি তখন দারুণ জমে উঠেছে। তিনজনের ওপরই সমান সন্দেহ। মেয়েটি, তার বর্তমান প্রেমিক আর তার মৃত স্বামীর কাগজপত্র-সমেত ব্রিফ কেস সমুদ্রতীরে যে কুড়িয়ে পেয়েছিল সেই লোকটি। মেয়েটির নাম মার্থা। বড় সম্ভ্রান্ত ধনীর ঘরের মেয়ে। নিজের সমাজ ছেড়ে ভালবেসে এক বাউন্ডুলে অভিনেতাকে বিয়ে করেছিল। চেষ্টা করেও স্বামীর স্বভাব শোধরাতে পারেনি, বিয়েও সুখের হয়নি। স্বামীর জুয়া আর বদ খেয়ালের টাকা জোগাতে-জোগাতে হয়রান হয়ে একদিন খেপে যায়। আর এক কপর্দকও স্বামীকে দেবে না বলে জানিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ করবার প্রতিজ্ঞা করে। স্বামীর তখন বেশ মত্তাবস্থা। সে মার্থাকে মারধোর করবার চেষ্টা করে। মার্থাকে ছেলেবেলা থেকে ভালবাসলেও যে বিয়ে করতে

পারেনি, সেই ইউজিন ছেলেটি সেখানে কী কারণে হঠাৎ এসে পড়েছিল। সে স্বামীর হাত থেকে মার্থাকে বাঁচায়। মার্থার স্বামীকে উত্তমমধ্যম কিছু দিয়ে বাড়ি থেকে বারও করে দেয়।

কিন্তু তার পর থেকেই মার্থার স্বামী একেবারে নিরুদ্দেশ। প্রায় মাসখানেক বাদে দূরের এক সমুদ্রতীরে তার একটি ব্যাগ একজন কুড়িয়ে পায়। ব্যাগটি পুলিশের হাতে যথারীতি দেওয়া হয় ও পুলিশ সেই ব্যাগে মার্থার স্বামীর হাতে লেখা সমুদ্রে ডুবে আত্মহত্যার সংকল্পের চিঠি পায়।

ব্যাপারটা সেখানেই চুকে যেত, কিন্তু কিছুদিন বাদেই মার্থার স্বামীর আত্মহত্যা সরকারিভাবে স্বীকার করবার খুঁটিনাটি সারতে গিয়ে পুলিশ ধরতে পারে যে মার্থার স্বামীর আত্মহত্যার চিঠিটি জাল। মার্থার স্বামীর হাতের লেখা সুকৌশলে কেউ নকল করবার চেষ্টা করেছে। আত্মহত্যা না করে থাকলে মার্থার স্বামীর কী হয়েছে তা হলে? সন্ধান করতে জানা যায় ইউজিনকে কিছুকাল আগেও ওই সমুদ্রতীরের হোটেলে দেখা গেছল। মার্থাও কয়েকদিন বাদে সেই হোটেলে এসে উঠে দিন-দুই থেকে আবার চলে যায়। মার্থা ও ইউজিন অবশ্য পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে জানায় যে হ্যারল্ডই বোঝাপড়া করতে ফোনে তাদের ডেকেছিল। হ্যারল্ডকে তারা অবশ্য পায়নি।

ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে সমুদ্রতীরে যে লোকটি মার্থার স্বামীর ফোলিও ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছিল তার ব্যবহারে। সে গোপনে একদিন মার্থার কাছে এসে একটি চিঠি দেখায়। চিঠিটি মার্থার স্বামী হ্যারল্ডের লেখা। লোকটি স্বীকার করে যে হ্যারল্ডের ব্রিফ কেসটি পুলিশের হাতে দেওয়ার সময় সে কিছু কাগজপত্র সরিয়ে রেখেছিল। চিঠিটা পড়ে বোঝা যায়, হ্যারল্ড সেটা মার্থার কাছেই লিখেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা ডাকে আর কেন পাঠায়নি কে জানে। হয়তো সময় পায়নি। চিঠি ছোট, তাতে হ্যারল্ড সকাতরে মার্থা ও ইউজিনকে তাকে রেহাই দিতে অনুরোধ করেছে। লিখেছে, প্রতি মুহূর্তে এই ভয়ে ভয়ে পালিয়ে বেড়িয়ে বাঁচা আর তার সহ্য হচ্ছে না। মার্থা বিবাহ-বিচ্ছেদ করে ইউজিনকেই বিয়ে করুক, সে বাধা দেবে না। সে শুধু নিরাপদ শান্তি চায়। তার জন্য সে আমেরিকা ছেড়ে অন্য দেশে চলে যেতেও প্রস্তুত।

মার্থাকে চিঠি পড়ে স্তম্ভিত মনে হয়। সে প্রথমে রেগে বলে, এ চিঠিও জাল। লোকটি সায় দিয়ে বলে, তা হওয়া সম্ভব। কিন্তু পুলিশের হাতে দেওয়া উচিত হলেও সে মার্থাকে একবার এটা দেখাতে এসেছিল। মার্থা এবার সোজাসুজিই চিঠিটা লোকটির কাছে কিনে নিতে চায়। লোকটি প্রথমে রাজি হয় না, কিন্তু শেষে প্রচুর টাকার বিনিময়ে চিঠিটি মার্থাকে দেয়। মার্থা গোপনে চিঠিটি একজন বড় হস্তাক্ষর-বিশারদকে দিয়ে পরীক্ষা করায়। তাতে জানা যায়, চিঠিটি জাল নয়।

পুলিশ এদিকে হ্যারল্ডের ব্যাগের জিনিসপত্র নতুন করে পরীক্ষা করতে গিয়ে সোনেরিল নামে একটি ওষুধের শিশির ভেতর কয়েকটি বিষাক্ত বড়ি পেয়েছে। ওষুধটা সেই জাতের যাতে স্নায়ু শান্ত রাখে। কিন্তু গোপনে অনেকে সেটা নেশা হিসেবে ব্যবহার করে। হ্যারল্ডও করত। কিন্তু শিশির ভেতর এই নকল করা চেহারার বিষাক্ত বড়ি গেল কী করে! পুলিশ খোঁজ নিয়ে জেনেছে তার পর যে ইউজিন শহরের এক মস্ত বড় ডিসপেন্সারির মালিক। মার্থার বাড়ি থেকে বিতাড়িত হবার পরে ইউজিনের দোকান থেকেই এক রাত্রে হ্যারল্ড ওষুধটি কেনে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিষাক্ত ও বদ নেশার জিনিস বলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে নাম-ঠিকানা লিখে এ ওষুধ নিতে হয়। ডিসপেন্সারির খাতায় হ্যারল্ডের ওষুধ কেনা তাই ধরা পড়েছে। সেই সঙ্গে একথাও জানা গেছে যে নিজে হাতে ওষুধ না বেচলেও ইউজিন সে রাত্রে ওই সময়ে দোকানের দৈনিক বিক্রির শেষ হিসাব নেবার জন্য ভেতরে ছিল।

হ্যারল্ডের ফোলিও ব্যাগ যে পেয়েছিল, তাকেও সন্দেহক্রমে পুলিশ এবার গ্রেপ্তার করেছে। মার্থার কাছে হ্যারল্ডের আগের চিঠি বেচবার পরই সে আবার একদিন হ্যারল্ডের লেখা একটি রোজনামচার বই নিয়ে আসে। তার ভেতরে হ্যারল্ডের হাতের লেখায় যা পাওয়া যায় তা সাংঘাতিক। সেখানে স্পষ্টই লেখা আছে যে দিনের পর দিন সে প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে কাটাচ্ছে।

5 JAN 2011

মার্থা ও ইউজিন তার পেছনে খুনে গুন্ডা লেলিয়ে দিয়েছে, সে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু পুলিশকে জানাতেও তার সাহস হচ্ছে না। তার মতো হতভাগা জুয়াড়ি মাতালের কথা কে বিশ্বাস করবে! মার্থা প্রচুর টাকা দিয়ে সে ডায়েরি কিনে নেবার পরই লোকটি গ্রেপ্তার হয়েছে। পুলিশ জানতে পেরেছে যে হ্যারল্ডকে শেষ দেখা যায় সমুদ্রতীরের বন্দর থেকে একটি ছোট মোটর-লঞ্চ ভাড়া করে এক রাত্রে সমুদ্রে বেড়াতে যেতে। তার সঙ্গে ওই লোকটিও ছিল বলে একজন অন্তত এজাহার দিয়েছে। পুলিশ আরও খুঁজে বার করেছে যে ওই লোকটি এককালে ইউজিনের অধীনেই কাজ করত। ইউজিন অবশ্য এই বলে সাফাই গেয়েছে যে লোকটির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। বহুকাল আগে চুরির অভিযোগে তাকে সে বরখাস্ত করেছিল মাত্র।

হ্যারল্ডকে তা হলে সত্যি পৃথিবী থেকে সরিয়েছে কে? ইউজিন একলা, না মার্থার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে? সে ষড়যন্ত্রে ওই লোকটিও কি ছিল, না ইউজিন বা সেই লোকটি একলাই একাজ করেছে?

ছবি শেষ হবার পর অভিভূতভাবে পরাশরের দিকে তাকিয়েছি। আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেও তখন সোজা হয়ে বসেছে। বললাম, 'কী যে তুমি হারালে তা জানো না! এ গল্পের শেষ তুমিও কল্পনা করতে পারতে না!'

'তাই নাকি!' পরাশরের সত্যি একটু আফসোস হয়েছে বলেই মনে হল।

অফিসেই ফিরে গিয়ে পরাশরের আমার কাছে আসার আসল কারণটা শুনতে হল। এমন কিছু জরুরি ব্যাপার আমার অবশ্য মনে হল না।

মজার কথা শুধু এই যে, এই ব্যাপারটাও একটা ফোলিও ব্যাগ সংক্রান্ত। খবরের কাগজে একটি ফোলিও ব্যাগ হারাবার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে বক্স নম্বর দিয়ে। কেউ সে ব্যাগ পেয়ে থাকলে যেন উক্ত বক্স নম্বরে চিঠি লেখেন। আসল মালিক তখন প্রমাণ দিয়ে ফোলিও ব্যাগ নিয়ে যাবেন এবং সেই সঙ্গে হাজার টাকা পুরস্কারও দেবেন।

পরাশরের অনুরোধ, আমিই যেন ব্যাগটি পেয়েছি বলে বক্স নম্বরে একটা চিঠি দিই।

'তার মানে?' হতভম্ব হয়ে বললাম, 'যে ব্যাগ চোখেও দেখিনি তাই পেয়েছি বলে চিঠি দেব!'

'আহা, দিয়েই দেখো না।' পরাশর অম্লান বদনে জানালে, 'কে ব্যাগটা চাইতে আসে দেখাই যাক না! তোমার বাড়ি—না, না—এই অফিসের ঠিকানাতেই দেখা করতে বলবে।'

একটু চটে উঠেই বললাম, 'এ তোমার আচ্ছা পাগলামির জুলুম দেখছি! কোথায় কী ব্যাগ কিছুর ঠিক নেই, এক হাজার টাকা পুরস্কারের লোভে একটা মিথ্যে চিঠি লিখব! পুরস্কারটা যখন অমন, তখন ব্যাগটা নিশ্চয়ই দামি। ব্যাগ না পেলে তো আর পুরস্কার কেউ দেবে না!'

হঠাৎ কথাটা মনে হওয়ায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি, তুমি কি ব্যাগটা পেয়েছ নাকি?'

আমায় একেবারে নির্বাক করে দিয়ে পরাশর নেহাত হালকা ভাবেই বলল, 'না পাইনি এখনও, কিন্তু পেতে পারি।'

পরাশরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব। যত তর্কই করি, শেষ পর্যন্ত তার আজগুবি অনুরোধ রাখতেই হল।

চিঠি দেবার দু-দিন বাদে দুপুরবেলা একটা ফোন পেলাম। ব্যাগ হারাবার বিজ্ঞাপন যিনি দিয়েছেন, কখন দেখা করতে এলে আমার সুবিধা হয়, তিনি জানতে চাইছেন। পরাশর যেরকম পরামর্শ দিয়েছিল, সেই অনুসারে অফিস বন্ধ হবার পর রাত আটটায় তাঁকে দেখা করতে বললাম। পরাশরকেও আগের ব্যবস্থামতো জানিয়ে দিলাম।

কী অস্বস্তিতে আটটা পর্যন্ত তারপর কাটল তা বোঝানো অসম্ভব। পরাশর সাড়ে সাতটা নাগাদ এল। মেজাজ তখন প্রায় সপ্তমে উঠেছে। তিক্ত স্বরে বললাম, 'ভদ্রলোক তো ব্যাগ নিতে আসছেন, এখন কী বলব, কী!'

'সে তোমায় ভাবতে হবে না, যা বলবার আমি বলব।' পরাশরের কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই যেন ছেলেখেলা।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আটটায় বেয়ারা রামদীন এসে খবর দিলে, একজন দেখা করতে এসেছেন। অফিসের সকলকে ছুটি দিয়ে এই রামদীনকেই শুধু রেখে দিয়েছিলাম ফাইফরমাশের জন্য। রামদীনের সসম্ভ্রমে ঘোষণা করবার ধরন থেকে যা অনুমান করেছিলাম, আগন্তুক ভদ্রলোকের চেহারা তার সঙ্গে মিলল। শুধু লম্বা চওড়া দশাসই নয়, দস্তুরমতো সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন চেহারা। সাজ-পোশাকে আড়ম্বর নেই, কিন্তু একবার চাইলেই বোঝা যায়, পদাতিকদের একজন তিনি নন। দামি গাড়িটা চোখে না দেখলেও যেন অনুমান করা যায়।

ভদ্রলোক নিজেই আগে পরিচয় দিলেন। আমার অনুরোধে সামনের চেয়ারে বসে আমাদের দু-জনকে হাত জোড় করে নমস্কার করে বললেন, 'আমার নাম উমাপতি রায়। আপনাদের চিঠি পেয়ে আমাকেই আসতে হয়েছে।'

পরাশর কী একটা বলতে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, 'যা আপনারা বলতে চাইছেন আমি জানি। বিজ্ঞাপনের উত্তরে যাঁর কাছে আপনি চিঠি দিয়েছিলেন, আমি সেই গুণধর হাজরা নই। কিন্তু আপনাদের চিঠি পেয়ে আমিই আপনাদের ফোন করেছিলাম এবং আমাকেই গুণধর হাজরার জায়গায় আসতে হয়েছে।'

'কেন বলুন তো!' সসম্ভ্রমে আমি প্রশ্ন করলাম। চেহারা দেখার পর নাম শুনে উমাপতিবাবুর পরিচয় আমি বুঝে ফেলেছি। বাঙালি ব্যবসায়ী মহলে বিচক্ষণ শিল্পপতি হিসাবে তাঁর নাম ইদানীং যথেষ্ট।

এক মুহূর্ত যেন ইতস্তত করে উমাপতিবাবু বললেন, 'আসতে হয়েছে, কারণ ওই বিজ্ঞাপন দেবার পর থেকে গুণধরবাবুকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তার মানে? আপনি তা হলে আমাদের চিঠি পেলেন কী করে? গুণধরবাবু হয়েই বা এলেন কেন?' পরাশর বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

'সব কথাই বলছি শুনুন' বলে উমাপতি যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই—উমাপতিবাবু নানা শিল্প ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত। তাঁর সমস্ত কাজের একরকম ডান হাত ও বিশ্বাসী সহায় এই গুণধর হাজরা। হাজরা তাঁর স্কুলের সহপাঠী ছিল, তারপর তাঁর ব্যবসায়ের একজন কর্মচারী হিসেবে ঢুকে নিজের ক্ষমতায় এত উঁচু দায়িত্বের পদে উঠেছে। অধিকাংশ জায়গায় উমাপতিবাবুর সে-ই প্রতিনিধি হয়ে যায়। দিন দশেক আগে এমনই একটি অত্যন্ত জরুরি কাজে বেরিয়ে কাজ না সেরেই হাজরা শুকনো ছাইয়ের মতো মুখ নিয়ে ফিরে আসে। যে ফোলিও ব্যাগে অত্যন্ত মূল্যবান দলিল ও কাগজপত্র নিয়ে হাজরা এই কাজে বেরিয়েছিল তা সে কোথায় হারিয়ে ফেলেছে, কিছুই মনে করতে পারছে না। এই মনে করতে না পারা উমাপতিবাবুর সব চেয়ে আশ্চর্য লেগেছে। হাজরার কিছুদিন যাবৎ শরীরটা একটু খারাপ যাচ্ছিল। কিছুদিন লম্বা ছুটি নিয়ে কোথাও বিশ্রাম করবার কথাও উমাপতিবাবু বলেছিলেন, কিন্তু এরকম স্মৃতিভ্রংশ হবার মতো কোনও লক্ষণ তখন তার মধ্যে ছিল না। কোনও উপায় না দেখে উমাপতিবাবু তাকে শেষ চেষ্টা হিসেবে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে বলেছিলেন। হাজরা তাই দিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তার পর দিন থেকেই সে নিরুদ্দেশ। বিজ্ঞাপনের উত্তরে কোনও হদিস মিলবে, এ আশা উমাপতিবাবুর ছিল না। আমাদের চিঠি পেয়ে তিনি তাই হাতে স্বর্গ পেয়েছেন। ব্যাগটি কী রকম ও তাতে কী কী ছিল, সমস্ত তিনি লিখে এনেছেন, সেই সঙ্গে পুরস্কারের টাকাও। এখন আমরা ফোলিও ব্যাগটি ফেরত দিয়ে যদি তাঁকে বাধিত করি।

উমাপতিবাবু একটি হাতে লেখা কাগজ আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে টাকার জন্যই পকেট থেকে ওয়ালেট বার করলেন।

পরাশরই কাগজটা হাতে নিয়ে উমাপতিবাবুকে বাধা দিয়ে বললে, 'টাকা এখন থাক, মি.

রায়। কিছু যদি মনে না করেন দু-একটা কথা তা হলে জিজ্ঞাসা করি।'

একটু বিস্মিত হয়েই উমাপতিবাবু বললেন, 'করুন।'

'গুণধরবাবুর হঠাৎ এরকম নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণ কী আপনার মনে হয়? টাকাকড়ি সংক্রান্ত কোনও গোলযোগ বা—'

উমাপতিবাবু পরাশরকে কথাটা শেষ করতে দিলেন না। একটু অপ্রসন্ন ভাবেই বললেন, 'শুনুন, গুণধর সম্বন্ধে কিছু জানলে এরকম কথা উচ্চারণও করতেন না। যুধিষ্ঠিরের ইতিগজ-টুকুও তার মধ্যে ছিল না। সারাজীবনে অনেকবার তাকে পরীক্ষা করে দেখেছি, তবে—'

উমাপতিবাবু হঠাৎ থেমে যেতে পরাশর বেশ একটু জোর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তবে কী?'

'না, ওই যা বলেছি, ইদানীং তার শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না।'

বেশ বোঝা গেল, উমাপতিবাবু কী একটা কথা চেপে গেলেন।

পরাশর কিন্তু এ নিয়ে আর পেড়াপীড়ি করলে না। তার বদলে জিজ্ঞাসা করলে, 'গুণধরবাবু নিরুদ্দেশ হবার পর সন্ধান নেবার কী ব্যবস্থা করেছেন? পুলিশে খবর নিশ্চয় দিয়েছেন!'

'পুলিশে!' উমাপতিবাবু একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, 'না, পুলিশে এখনও খবর দিইনি। শিল্প-ব্যবসার একেবারে ওপর তলার বাজার কী রকম কান-পাতলা আপনারা জানেন না। এতটুকু কানাঘুষায় রাতারাতি সেখানে রাজ্য উলটে যায়। রায়-সিন্ডিকেটের গুণধর হাজরা অমূল্য সব কাগজপত্র সমেত হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছে ঘুণাক্ষরে জানলে এখুনি সেখানে ভূমিকম্প শুরু হয়ে যাবে। তাই গোপনে যা খোঁজ নেবার, নিচ্ছি আর একান্তভাবে আশা করছি গুণধর এখনও ফিরে আসবে।'

উমাপতিবাবুর গলাটা শেষ কথাগুলোর সময় একটু যেন ধরা শোনাল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তিনি আবার বললেন, 'এসব কথা আপনাদের বলার দরকার ছিল না, উচিতও নয়। তবে ফোলিও ব্যাগটা ফেরত দিয়ে আসল সর্বনাশ থেকে আপনারা বাঁচাচ্ছেন বলেই বোধহয় এত কথা কৃতজ্ঞতায় বলে ফেললাম। আচ্ছা, অনুগ্রহ করে ব্যাগটা যদি এবার দেন।'

'ব্যাগটা আজ আপনাকে দিতে পারছি না, মি. রায়।'

'কেন?' উমাপতিবাবুর গলা ও মুখের চেহারা এক মুহূর্তে বদলে গেল। যাঁর আঙুল নাড়ায় হাজার হাজার লোকের ভাগ্যের চাকা ঘোরে, সেই জবরদস্ত মানুষের অসহিষ্ণুতার সুরই পাওয়া গেল তাঁর কণ্ঠে—'যে প্রমাণ আমি দিচ্ছি তা কি যথেষ্ট নয়? না, সুবিধে পেয়ে আরও বেশি টাকা নিংড়ে নিতে চান? বেশ, বেশি টাকাই পাবেন। হাজারের জায়গায় দু-হাজার, নয় পাঁচ হাজার। দেখি আমার ব্যাগ।'

আমি তখন প্রমাদ গনছি, কিন্তু পরাশর নির্বিকার। একটু হেসে সে বললে, 'অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন, মি. রায়? বেশি টাকা আমরা চাই না। ফোলিও ব্যাগও আপনাকেই দেব। কিন্তু আজ নয়, কাল।'

'কাল, কখন?' উমাপতিবাবুর স্বর অত্যন্ত কঠিন।

'এই ধরুন, বেলা দুটোয় আপনার অফিসেই নিয়ে যাব।'

'বেশ, তা-ই যাবেন। যেন ভুল না হয়।'

উমাপতিবাবু নমস্কার পর্যন্ত না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি সভয়ে পরাশরের দিকে ফিরে বললাম, 'কী ফ্যাসাদ এখন বাধালে বলো তো? আজ তো ধাপ্পা দিয়ে ঠেকালে, কিন্তু কাল দুটোর মধ্যে ও ব্যাগ কি ভেলকিতে তৈরি হবে?'

'হবে, হবে! তুমি ভেবো না, কাল বেলা দেড়টায় তৈরি থেকো, আমি এসে নিয়ে যাব তোমায়!' বলে পরাশরও বেরিয়ে গেল।

পরের দিন ঠিক বেলা দেড়টায় সে হাজির। আর হাতে তার সত্যি দামি চামড়ার একটা ফোলিও ব্যাগ।

প্রথমে অবাক হলেও পরে ব্যাপারটা আন্দাজ করে বললাম, 'ও ব্যাগ তা হলে তুমি আগেই পেয়েছিলে!'

'না।' বলে পরাশর হাসল।

'তা হলে এখন পেলে কোথায়, কী করে?'

'পেলাম ট্রাম-কোম্পানির অফিসে প্রমাণ দিয়ে!' আমার হতভম্ব চেহারা দেখে পরাশর ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে বিশদভাবে। 'টাকাকড়ি যখন নেই, তখন ব্যাগটা নেহাত চোর ছ্যাচড়ের হাতে না পড়লে মারা যাবে না আমি বুঝেছিলাম। স্টেট ট্রান্সপোর্ট, বাস সিন্ডিকেট, ট্রাম কোম্পানির অফিস আর থানা সব জায়গাতেই ও বিজ্ঞাপন পড়বার পর আমি খোঁজ নিই। তার মধ্যে ট্রাম কোম্পানির অফিসেই ওরকম একটা ব্যাগের সন্ধান মেলে, কিন্তু তখনও প্রমাণ হাতে নেই। কাল মিস্টার রায়ের কাছে প্রমাণের যে কাগজ পেয়েছি, তারই জোরে আজ ব্যাগ ছাড়িয়ে নিয়ে এলাম!'

'ওই ব্যাগ হারাবার একটা সামান্য বিজ্ঞাপন পড়ে এত কাণ্ড তুমি করেছ?'

'বাঃ, হাজার টাকা পুরস্কার নিতে হবে না!' বলে আমায় একরকম টানতে-টানতে পরাশর অফিস থেকে বাইরে নিয়ে গেল।

উমাপতিবাবুর নিজস্ব অফিস কামরায় যখন পৌঁছোলাম তখনও দুটো বাজতে পাঁচ মিনিট।

তাঁর খাস কামরায় ঢোকবার সময় উমাপতিবাবুর মুখে যে ভ্রুকুটিটুকু ছিল, পরাশরের হাতের ব্যাগটা দেখে তা কোথায় উবে গিয়ে প্রায় আকর্ণবিস্তৃত হাসি দেখা গেল। অভ্যর্থনার ঘটা তখন দেখে কে!

'আসুন, আসুন, বসুন। কী আনব বলুন, চা, কফি? কোল্ড ড্রিঙ্ক?'

'কিছু না। আগে ব্যাগটা পরীক্ষা করে দেখুন, সব ঠিক আছে কি না!' পরাশর ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখল।

এ অনুরোধ আর দুবার করতে হল না। ব্যাগটা খুলে কাগজপত্রগুলো তাড়াতাড়িতেও বেশ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে উমাপতিবাবু হেসে বললেন, 'না, সব ঠিক আছে। এখন কত টাকার চেক লিখব, বলুন!'

'তার আগে ব্যাগটা আর একটু ভাল করে দেখলে হত না! সবই ঠিক আছে বলছেন!'

একটু অবাক হয়ে আর একবার কাগজগুলো গুণে উমাপতিবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আছে তো দেখছি।'

পকেট থেকে একটা ছোট প্যাকেট বার করে পরাশর বললে, 'এই ওষুধটাও ব্যাগে ছিল।'

'তাই নাকি!' প্যাকেটটা হাতে নিয়ে উমাপতিবাবু বললেন, 'এ তো দেখছি অ্যাভোমিন।'

'হ্যাঁ, প্লেন বা জাহাজে চড়লে যাদের মাথা ঘোরে বা গা গুলোয়, তাদের দরকার হয়। জাহাজে তো নিশ্চয় নয়, গুণধরবাবু প্লেনে সম্প্রতি কোথাও গেছলেন?'

'প্লেনে? হ্যাঁ, আসামে আমাদের এক চা বাগানে কিছুদিন আগেই গেছল আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি তখন সেখানে ছিলাম।'

'এই ফোলিও ব্যাগ হারাবার আগেই?'

উমাপতিবাবু মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, সেখান থেকে ফেরার পরই এই ব্যাপার ঘটে। আমি তার দু-দিন বাদে ফিরে জানতে পারি।'

'কাল যে কথাটা চেপে গেছলেন সেটা এখন তা হলে বলুন, মি. রায়।' পরাশরের প্রায় যেন আদেশের সুর।

একটু থতমত খেয়েও উমাপতিবাবু বিস্ময়ের ভান করলেন। 'কী কথা আমি চেপে গিয়েছি?'

'বলতে গিয়েও গুণধরবাবু সম্বন্ধে যে কথাটা বলেননি।'

পরাশরের স্থির দৃষ্টির সামনে বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করেই উমাপতিবাবু আবার গরম হয়ে উঠলেন—'যদি না বলে থাকি, তাতেই বা কী হয়েছে! ব্যাগ ফেরত দিয়েছেন পুরস্কার নিয়ে যান। আমায় জেরা করবার কী অধিকার আপনার আছে?'

'জেরা করবার অধিকার নেই, আছে সাহায্য করবার ইচ্ছে।'

'ধন্যবাদ! আপনার সাহায্যে আমার দরকার নেই।' উমাপতিবাবু একটা মোটা খাম পরাশরের দিকে একরকম ছুড়েই দিলেন যেন। বুঝলাম, তাতেই পুরস্কারের টাকা।

সেটাকে অগ্রাহ্য করে পরাশর গম্ভীরভাবে বললে, 'সাহায্য না চান, সত্য কথাটা শুনে রাখুন। তাড়াতাড়িতে পরীক্ষা করে আপনি বুঝতে পারেননি, ও ব্যাগের বেশির ভাগ কাগজপত্র ও সিকিউরিটি জাল।'

ঘরে সত্যিই যেন বজ্রপাত হল। নির্বোধের মতো খানিক চেয়ে থেকে উমাপতিবাবু অস্ফুট স্বরে বললেন, 'জাল!' তারপর একটানে কাগজপত্রগুলো ব্যাগ থেকে বার করে তিনি সেগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়লেন। কিছুক্ষণ বাদে তাঁর মুখের চেহারা দেখেই বোঝা গেল, পরাশর মিথ্যে বলেনি।

উমাপতিবাবু বিহ্বলভাবে বললেন, 'এর মানে?'

'মানে অনেক গভীর।' পরাশর শান্ত ও দৃঢ় স্বরে জানালে, 'শুধু এই সামান্য ক-টাই নয়, আমার বিশ্বাস রায় সিন্ডিকেটের এরকম বহু দামি শেয়ার ও সিকিউরিটির কাগজপত্র গত এক বছর ধরে সিন্দুক থেকে সরে গিয়ে তার জায়গায় জাল কাগজ রাখা হয়েছে। সত্য কথাটা তা হলে শুনুন, এইরকম একটা গোলমেলে ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হয়ে একটি ব্যাঙ্ক গোপনে এ ব্যাপারে তদন্ত করবার জন্যে আজ দু-মাস হল আমার ওপর ভার দিয়েছে।'

'আপনাকে!'

'হ্যাঁ,' পরাশর সবিনয়ে বললে, 'আমি মাঝে মাঝে এসব কাজ করি। নাম পরাশর বর্মা।'

পরাশর বর্মা নামটা উমাপতিবাবুর খুব পরিচিত বলে মনে হল না। তিনি শুধু হতাশভাবে বললেন, 'এখন উপায়, মি. বর্মা।'

'উপায়—গুণধর হাজরাকে খুঁজে বার করা। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে কিছু গোপন করবেন না। বলুন, সেদিন কী কথা চেপে গিয়েছিলেন।'

'সে এমন কিছু নয়, মি. বর্মা। এ ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনও যোগ আছে বলেও মনে করি না। আমি আবার বলছি, গুণধর যুধিষ্ঠিরের মতো সৎ ও সাধু।'

'সাধুদেরও পতন হয়, মি. রায়। এখন বলুন যা লুকিয়েছেন।'

'না, লুকোইনি ঠিক, তবে গুণধরের একটা ব্যাপার ইদানীং একটু খারাপ লাগছিল। তার কোথাও কেউ নেই। বিয়ে থা করেনি। সারাজীবন একা কাটিয়েছে। সম্প্রতি কোনও একটি মেয়ের পাল্লায় বুড়ো বয়সে সে পড়েছে মনে হচ্ছে।'

'কে সে মেয়ে?'

'জানি না। একদিন রাস্তায় তার সঙ্গে দেখেছিলাম। গুণধরের তুলনায় বয়স অনেক কম। সুন্দরীও বলা চলে। সকলেরই শত্রু থাকে। গুণধরেরও ছিল। কেউ কেউ আমাকে ইঙ্গিত করতে চেষ্টা করেছে, আমি কান দিইনি, গুণধরকেও কখনও কিছু জিজ্ঞাসাও করিনি।'

একটু চুপ করে থেকে পরাশর জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা, গুণধরবাবুর কি হার্টের অসুখ ছিল?'

'হার্টের অসুখ!' উমাপতিবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'আমি তো অন্তত জানি না। কিন্তু এ প্রশ্ন করছেন কেন?'

'তা এখন না-ই জানলেন। হার্টের অসুখ তা হলে ছিল না বলছেন?'

'না,' উমাপতিবাবু একটু ভেবে বললেন, 'তা-ই বা কী করে বলি। কিছুদিন তার শরীরটা

খারাপ যাচ্ছিল, আগেই বলেছি। কিন্তু সেটা সাধারণ লিভারের দোষটোষই ভেবেছিলাম। দাঁড়ান, দাঁড়ান, একদিন এই ঘরে হঠাৎ বুকটা চেপে সে বসে পড়েছিল মনে আছে। জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল, ও কিছু নয়। গুণধর এমনিতেই খুব কম কথা বলে।'

'ধন্যবাদ।' পরাশর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'মনে হচ্ছে দু-চার দিনের ভেতরেই গুণধরবাবুকে আপনার সামনে হাজির করতে পারব। জাল কাগজপত্রের রহস্য তখন বোঝা যাবে।'

'গুণধরকে সত্যি দু-চার দিনেই পাবেন আশা করেন?' উমাপতিবাবু ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

'তাই তো করি। রোগাটে লম্বা ময়লা রং, মাথার সামনে টাক পড়তে শুরু করেছে। পোশাকে আশাকে একটু ঢিলেঢালা—এই তাঁর বর্ণনা তো?'

সায় দিয়ে উমাপতিবাবু বললেন, 'পুরস্কারটা নিয়ে যান তা হলে।'

'না, এখন থাক। ওর চেয়ে বড় পুরস্কারই আপনার কাছে নেবার আশা করি।' বলে পরাশর আমায় নিয়ে বেরিয়ে এল।

তারপর পরাশর বর্মার সব জারিজুরি ভাঙবার দাখিল। দু-চার দিনের জায়গায় সাতদিন কেটে গেল, গুণধরের টিকির খোঁজ মিলল না।

এ কয়দিন আমার হয়রানিরও অন্ত নেই। অফিস থেকে যেটুকু ছাড়া পাই, তার বদলে শহরের সর্বত্র ওষুধের দোকানে ঘুরতে হয়। পরাশর কী যে এক অদ্ভুত ওষুধের দোকানে দোকানে নাম করে, ছোটখাটো দোকান তো জানেই না, খুব কম বড় দোকানেই সেটা পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত চৌরঙ্গি ও অন্যান্য অঞ্চলের যে ক-টি দোকানে ওষুধটা পাওয়া গেল, তারাও প্রেসক্রিপশন ছাড়া সে ওষুধ দিতে নারাজ। কিন্তু পরাশরও নাছোড়বান্দা। যেখানে যেমন, ম্যানেজার বা মালিকের সঙ্গে তারপর তার দেখা করা চাই। কী যে তর্কাতর্কি সে তাদের সঙ্গে করে জানি না, কারণ আমি বেশির ভাগ বিরক্ত হয়ে বাইরেই তখন থাকি। কিন্তু ওষুধটা পেতে তাকে কোথাও দেখলাম না।

শেষে একদিন জ্বালাতন হয়ে তাকে বললাম, 'অত যদি ওষুধটার দরকার, কোনও ডাক্তারকে দিয়ে প্রেসক্রিপশন করিয়ে নিলেই তো পারো।'

'প্রেসক্রিপশন করাব!' পরাশর যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'হ্যাঁ, তোমার এই পাগলামির ধারে কাছে আমি পারতপক্ষে থাকি না, কিন্তু সেদিন কোন দোকানে যেন কোনও মেয়েটেয়ে প্রেসক্রিপশন এনে এ ওষুধ নিয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করছিলে না? ওই কথাটা কানে গেছল, তাই বলছি।'

'ঠিকই বলেছ।' বলে পরাশর আমার পরামর্শটাকে বেমালুম চাপা দিলে।

তার পরদিনই। সন্ধ্যায় আমার অফিসে এসে পরাশর আমায় এই মারে তো সেই মারে! সে কী তার মেজাজ!

'তোমার জন্যেই আমার এই হাল!'

হতভম্ব হয়ে বললাম, 'আমি আবার কী করেছি?'

'কী করেছ? ও একটা রদ্দি ছবি দেখতে জোর করে নিয়ে গেছল কে! ওই ছবির ছাপ মনের উপর ছিল বলেই আমার সব গুলিয়ে গেছল। ওসব বাজে ছবি কখনও দেখতে আছে?'

'কিন্তু তুমি ছবি দেখলে কখন! অর্ধেকটা পর্যন্ত না দেখেই তো ঘুমিয়েছ, শেষ কী হল তাও জানো না।'

'জানি না! তোমার পকেটে যে কাগজটা দিয়েছিলাম সেটা পড়েছ?'

তাই তো! কী ভাগ্যি কাগজটা তখনও পকেটে ছিল। বার করে পড়ে সত্যি আমি থ। অভিভূতের মতো জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি আগেই বুঝতে পেরেছিলে!'

'তার প্রমাণ তো তোমার হাতেই রয়েছে, কিন্তু এখন ওসব বাজে কথার সময় নেই।' বলে

সে ফোন ধরে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের একজন মাথাকে যা জানাল, তাতে আমি একেবারে স্তম্ভিত।

লালবাজারের ফোন সেরে সে স্বয়ং উমাপতিবাবুকেই ফোনে ডাকল, 'হ্যালো, হ্যাঁ, মিস্টার রায়কে দিন। তিনি ব্যস্ত! তা হোক, বলুন পরাশর বর্মা ডাকছেন, তা হলেই হবে।'

তাই হল। পরাশর বর্মার নামে উমাপতিবাবু নিজেই ফোন ধরলেন এবার।

'হ্যালো! হ্যাঁ, আমি বর্মা, আপনার কাছে এখুনি যাচ্ছি।...এখুনি বেরোচ্ছিলেন? তবু আধঘণ্টা একটু অপেক্ষা করুন। সব রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেছে। গিয়ে সব বলছি।...আপনার এখন একেবারে সময় নেই? কিন্তু এ কাজটা যে সবচেয়ে জরুরি, মি. রায়।...গুণধরবাবুকে? না, তাঁকে পাইনি, তবে পাব নিশ্চয়। তাঁর মৃতদেহটা অবশ্য। আবোলতাবোল বকছি? না, সেখানে পুলিশ খোঁজ শুরু করেছে, খবর এল বলে।...আপনার চা বাগানের নিজস্ব নির্জন বাংলো থেকে বেরিয়ে যে পাহাড়ি রাস্তাটা গৌহাটির দিকে গেছে, তারই পাশের কোনও খাদে অবশ্যই পাওয়া যাবে।...না, না, ফোন ছাড়বেন না, অনেক কথা এখন বাকি।...রায় সিন্ডিকেটের টালবেটাল অবস্থা সামলাতে নিজেই যেসব কাগজ জাল করেছেন, ফাটকা বাজারে বেনামীতে যত শেয়ার কেনা-বেচার জুয়া খেলেছেন, শেষ পর্যন্ত একমাত্র বিশ্বাসী বন্ধু ও সহায় গুণধর হাজরাই যেন সব নষ্টের মূল বুঝিয়ে তার নিরুদ্দেশ হওয়াটা যেভাবে সাজিয়েছেন, সব কথা বলতে হবে যে!...সব কিছু মিথ্যার মধ্যে একটা সত্যি কথা আপনি শুধু বলেছিলেন, মি. রায়। বলেছিলেন যে গুণধর হাজরা যুধিষ্ঠিরের মতো সাচ্চা মানুষ। বাল্যবন্ধু বলেও সেই সাচ্চা মানুষ আপনার সব কীর্তি শেষ পর্যন্ত বুঝে ফেলে বেঁকে দাঁড়িয়েছিল বলেই আপনি তাকে মিথ্যে অজুহাতে চা বাগানে ডাকিয়ে যেভাবে হোক দুনিয়া থেকে সরাবার ব্যবস্থা করেন।...পাগলের প্রলাপ আর শুনতে চান না?...এখুনি বেরোচ্ছেন? কিন্তু তা তো পারবেন না। লালবাজারে খবর গেছে, তারা এতক্ষণে আপনার অফিস নিশ্চয়ই ঘেরাও করে ফেলেছে—কী হল?'

ফোনের ভেতরই ঝনঝনাৎ করে একটা কী পড়ে যাওয়ার আওয়াজ আমিও পেলাম।

'হ্যালো, হ্যালো' করে কয়েকবার ডেকে পরাশরও ফোনটা নামিয়ে রেখে হতাশভাবে বললে, 'না—মিস্টার রায় এখন সব গ্রেপ্তারি পরোয়ানার বাইরে।'

'তার মানে?'

'মানে! পুলিশ গিয়ে ওঁর মৃতদেহটাই পাবে। ওঁরই হার্টের অসুখ। ফোলিও ব্যাগে অ্যাভোমিন-এর সঙ্গে একটা পেন্টানাইট্রাইট-এর শিশিও আমি পাই। রোগ যাদের গুরুতর হার্টের হঠাৎ ব্যথা উঠলে তারা খায়। এ ক দিন সব ওষুধের দোকানে এই ওষুধটারই আমি খোঁজ করেছি, কে কে সম্প্রতি এ ওষুধ কিনেছে জানবার আশায়। আমার ধারণা ছিল ওষুধটা যখন ব্যাগে থেকে গেছে, তখন গুণধর হাজরা নিজে বা তার বুড়ো বয়সের প্রেমিকা সেই মেয়েটির সাহায্যে এ ওষুধ কোথাও কেনার চেষ্টা করবেই। কিন্তু গুণধরবাবুর হার্টের অসুখই ছিল না, তার প্রেমের গল্পটাও মিস্টার রায়ের বানানো। তোমার সঙ্গে ওই বাজে ছবি দেখতে না গেলে গোড়াতেই মিস্টার রায়ের কারসাজি আমি ধরে ফেলতাম।'

একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, 'কিন্তু ও ছবি দেখে তোমার মাথা গুলোল কেন? ওখানে তো শেষ পর্যন্ত জানা গেল যে হ্যারল্ড সত্যি মরেনি। মার্থার কাছে টাকা আদায়ের আর তাকে ও ইউজিনকে জব্দ করার জন্যে সে-ই নিজের মৃত্যুটা ওইভাবে সাজিয়ে সেই লোকটির সাহায্যে সকলকে ধোঁকা দিচ্ছিল।'

'হ্যাঁ, ওই ছবিটা মাথায় থাকার দরুনই আমি একরকম চোখ বন্ধ করে ধরে নিয়েছিলাম যে গুণধর হাজরাই রায় সিন্ডিকেটকে ফাঁক করে ফোলিও ব্যাগটা ফন্দি করে ট্রামে ফেলে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে আছে। ব্যাগটা ইচ্ছে করেই ট্রামে ফেলে যাওয়া হয়েছিল সত্যি, কিন্তু ফেলে গেছল গুণধর নয়, মি. রায়। আসামের চা বাগান থেকে গুণধরের ওই ব্যাগটি নিয়েই তিনি কলকাতায়

আসেন ও একদিন ট্রামে ফেলে গিয়ে গুণধরের নামে ওই বিজ্ঞাপন দেন। ব্যাগে যে মনের ভুলে অ্যাডোমিন আর পেন্টানাইট্রাইট-এর শিশি দুটো থেকে গেছে, তাঁর খেয়ালই হয়নি।'

'কিন্তু ছবিতে হ্যারল্ডই যে আসল শয়তান, ওইটুকু দেখে বুঝেছিলে কী করে?'

'বুঝেছিলাম হ্যারল্ডের বা যে গল্প লিখেছে তার অতি বুদ্ধির বহর দেখে। আত্মহত্যার বদলে খুন প্রমাণ করবার জন্যে ফোলিও ব্যাগে জাল চিঠিই যথেষ্ট। তার ওপর আবার বিষের বড়ির ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি। বিষে যদি কেউ মরে তো তা হলে সমুদ্রের তীরে তার ব্যাগটা শুধু পড়ে থাকবে কেন! আর ব্যাগটা যে লোকটি পায়, আর যাকে এক রাত্রে মোটর বোটে হ্যারল্ডের সঙ্গে যেতে দেখা যায়, সে নিজের গরজে বা কারও টাকা খেয়ে যদি হ্যারল্ডকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়ে থাকে, তা হলে ব্যাগটা সে সাধ করে পুলিশের হাতে নিশ্চয় দেবে না! নাঃ, ওসব বাজে ছবি আর কখনও দেখবে না, তার চেয়ে বুদ্ধিতে শান দেবার জন্যে আধুনিক কবিতা পড়া অনেক ভাল।'

pathagar.net